

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদের রূপ

উৎপল দত্তের নাট্য পরিচিতি : মানুষের জীবনই শিল্পের বিষয়। মানুষের জীবনাচরণের ভিতর থেকে উৎসারিত হয় শিল্পচর্চার নির্যাস। মানুষ জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে চায়। অথচ বাইরের ও ভিতরের নানা বাধা তার জীবনে সুন্দরের ও সুখের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এই বাধার কাছে নত হয়, আত্ম সমর্পণ করে, অনেকে আবার তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। লড়াই যারা করে তারা প্রতিবাদী, স্বীকার যারা করে তারা সমর্পণ বাদী। যাঁরা সমাজ, রাষ্ট্র বা কোনো বহিরারোপিত বাণীকে জীবন যাপনের প্রতিবন্ধক মনে করেন তাঁদের এই জীবনাচরণের অন্যতম প্রধান দিক হল প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদী চেতনাই তাঁদের জীবনকে চলমান, বেগমান ও সৃষ্টি ধর্মী করে তোলে। মিথ্যা বা অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না থাকলে জীবন হয়ে পড়ত অচল ও নিষ্ক্রিয়। মানুষ প্রগতিকামী, সে বেড়ে উঠতে চায়, এগিয়ে যেতে চায়। আর সে কারণেই সে অগ্রগতির প্রতিবন্ধক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মানুষের সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে নাটক যেহেতু জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম তাই এই মাধ্যমে মানুষের প্রতিবাদী চেতনার কথা বেশি প্রতিফলিত হয়। জগৎ ও জীবনের প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে জাগরিত হয় প্রতিবাদী চেতনা, কখনও প্রত্যক্ষ বা কখনও পরোক্ষভাবে। উৎপল দত্তের নাটকেও রয়েছে এই প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ। অবশ্য এর পেছনে বেশ কিছু ঘটনা ও বিষয়ের প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবন ও মানস গঠনে।

উৎপল দত্ত আমাদের মত সমর্পণবাদী হতাশাগ্রস্ত দুর্বল মানবসমাজে অত্যন্ত প্রবল এক প্রতিবাদীচেতনার মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর যে পারিবারিক পরিবেশ তাতে এই প্রতিবাদী সত্তাটাই গড়ে ওঠার কথা নয়। তাঁদের পরিবারের সকলেই তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সামাজিক দিক থেকে কৃতী এবং স্বচ্ছল মানুষ। উৎপলেরও তাই হবার কথা ছিল। আবাল্য ইংরেজি শিক্ষায় লালিত তখনকার অভিজাত স্কুল কলেজে শিক্ষিত উৎপলের পক্ষে অন্য কিছু হওয়াই মুসকিল ছিল। তাও তিনি সেই প্রতিষ্ঠার মোহে পড়েননি, প্রতিবাদের জীবনের প্রতিষ্ঠার ছক ভেঙে ফেলেছিলেন।

উৎপল যখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন সে সময়ই তাঁদের বাড়িতে

বিভিন্ন নাটকের রেকর্ড সংগ্রহ করা হত। উৎপল খুব মনোযোগ সহকারে সে সকল নাটকের রেকর্ড শুনে মুগ্ধ করতেন। উৎপলের মেজো দাদা মিহির রঞ্জন উৎপল ও অন্যান্য ভাইবোনদের শেক্সপিয়ারের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতেন। সে সময়ই শেক্সপিয়ারের নাটক সম্পর্কে তাঁর একটা কল্পনার জগতে যাত্রা শুরু হয়। কালজয়ী নাট্যকারের রোমাঞ্চকর সেই হাতছানি এক স্বপ্ন দেখা কিশোরকে কালক্রমে জগৎবিখ্যাত শেক্সপিয়ার বিশেষজ্ঞে পরিণত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্কুল জীবনেই উৎপল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের লাল ফৌজের আত্মত্যাগ, মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়েন। তিনি তখনই সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পৃথিবী ব্যাপী ফ্যাসিবাদের হিংস্র আক্রমণ ও অগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে জনযুদ্ধের ডাক দিয়েছিল, তার চেউ স্কুলবালক উৎপলকেও আলোড়িত করে তুলেছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাঁর ছাত্র জীবনের প্রথম চার বছর (১৯৪৫-৪৯খ্রীঃ) ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অগ্নিগর্ভ ঝড়ের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী মারণযন্ত্র, দেশ বিভাগ, মড়কের কালান্তক ছায়া, নৌ বিদ্রোহের উত্তাল গৌরব গাথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবৃক্ষ এবং স্বদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কমিউনিষ্ট পার্টির নিষিদ্ধ ঘোষণা, স্কুল জীবন থেকেই সাম্যবাদী ভাবধারা, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও মার্কসবাদ উৎপলের কিশোর মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। স্তালিনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও পুস্তিকা তাঁর চিন্তা-চেতনাকে শাণিত করে তুলেছিল। মাত্র ষোলো বছর বয়সে কলেজে প্রবেশের সময়কালে তিনি চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্য, ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। উৎপল রচিত ‘লিটল থিয়েটার ও আমি’ নামক স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে স্কুলে পড়ার বয়সেই তিনি মার্কস এঙ্গেলস, লেলিন এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্ট পাঠে সমুদ্র হয়েছিলেন।^১ এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

উৎপল দত্তকে একই সঙ্গে বাংলা নাটকের ব্রেক্ট ও পিসকাটার বলে অভিহিত করার পরেও সমালোচক তাঁর সমগ্র নাট্য সত্তার পরিচয় ব্যক্ত হয়নি বলে মনে করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন উৎপল দত্তের মতো একাধারে খ্যাতিমান নট-নাট্যকার নাট্যপরিচালকের জুড়ি নাট্য জগতে বিরল। আরউইন পিসকাটার ছিলেন জার্মানীর থিয়েটার পরিচালক এবং প্রযোজক; ব্রেক্ট জার্মানীর বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও নাট্যকার। দুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে এপিক থিয়েটার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের কেউ নামকরা অভিনেতা নন। কাজেই দুই ব্যক্তির পরিচয়ের বাইরেও থেকে গেছে যে মানুষের নাট্যকৃতিত্ব তাঁকে দু’জনের সম্মিলিত সত্তা দিয়েও ব্যাখ্যা করার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থেকে যাবেই। তবে এই দুই নাট্যকার এবং পরিচালক ‘এপিক থিয়েটার’ প্রবর্তন করে

নাটকের মধ্যে যে সমাজ-রাজনীতির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন—এদের অনুসরণে উৎপল দত্তও সেই কাজই করেছেন। তিনিও তাঁর প্রচার মাধ্যম হিসেবে ‘এপিক থিয়েটার’ নাম দিয়ে একটি ‘মুখপত্র’ প্রকাশ করেছিলেন। নাটকের শিল্প সৌন্দর্য অপেক্ষা সমাজ ও রাজনীতির সমস্যাকে তুলে ধরাটাকে তিনি বেশি দরকারি বলে মনে করেছিলেন। সেই কাজই নাট্যকার এবং প্রযোজক পরিচালক হিসেবে আজীবন করে গেছেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র হিসেবে অভিনয় করার শুরু হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়কেই জীবনে পেশা করে তোলবার ভাবনাটা এর বেশ কিছুদিন পরে আসে। জেফ্রি কেণ্ডালের দলে যোগ দিয়ে অভিনয় শিক্ষা পর্ব থেকেই নাটক হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মূল প্রকাশ মাধ্যম এবং মুখ্য পেশা। এ্যামেচার শেক্সপিరిয়ান পর্ব থেকে লিটল থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করা এবং নিয়মিত নানা ইংরেজি ও পরে বাংলা নাটকের অভিনয় করবার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যাভিনেতা জীবনের বিস্তার ঘটে। ১৯৫০ থেকে লিটল থিয়েটার গ্রুপ বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু করে। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে বাংলা দেশের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রয়োজনে তাঁদের বাংলা নাটকের অভিনয়ে নামতে হয়েছিল। দেশের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক অবস্থার আবর্তে নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের দায় স্বীকার করে এরা বহু মানুষের কাছে বার্তা পাঠাতে চাইছিলেন—দেশের তখনকার আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে উঠতে চাইছিলেন। ১৯৫০ সালে শিউলি মজুমদার অনূদিত ‘গোস্টস’ নাটকের অনুবাদের মধ্যদিয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপের বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু। ইবসেন, শেক্সপিয়ার, নিকোলাই গোগোল, গলসওয়ার্দি প্রমুখ নামকরা বিদেশি নাট্যকারের পাশে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালি নাট্যকারদের আটত্রিশটি নাটক অভিনয় করেছে লিটল থিয়েটার গ্রুপ। এর মাঝে মাঝে ইংরেজি থিয়েটারও করেছে। এ পর্যন্ত যে সব অভিনয় করা হয়েছে সেগুলি হয় বিদেশি অনুবাদ নয় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কয়েকটি বাছাই করা বাংলা নাটক। কিন্তু নিয়মিত নাট্যাভিনয় চালিয়ে যাবার জন্য যে ধরণের নাটকের প্রয়োজন তাঁরা তার অভাব বোধ করছিলেন। ফলে নতুন নাটকের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। উৎপল দত্ত এতদিন কোনো নাটক লেখার কথা হয়তো ভেবেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। নাটক লেখার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন শোভা সেনের তাগিদেই তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। কিন্তু গবেষণার দৌলতে আমরা এখন জানি তাঁর প্রথম অভিনয়যোগ্য নাটক ‘ছায়ানট’ রচনার আগেও তিনি নাটক লেখার চেষ্টা করেছিলেন। ‘মীরকাশিমকে’ নিয়ে লেখা যে নাটকটি নাটক সমগ্রের অষ্টম খণ্ডে ছাপা হয়েছে সেটি তাঁর প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন গোপনে ছিল। এর পর শোভাসেনের তাগিদে নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে তিনি ‘ছায়ানট’ নাটক লিখলেন। লিটল থিয়েটার গ্রুপের দ্বিতীয়

নাট্যোৎসবে ‘ছায়ানট’ প্রথম অভিনীত হল। ‘ছায়ানট’ সিনেমার ভিতরের গল্প সিনেমা তৈরির গল্প। উৎপল এ জগৎটাকে চিনতেন। এর exploitation কেও চিনতেন। এর পিছনে-মানবিকতার কোনো মূল্য ছিল না, ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থের চরিতার্থতা। যে বানিয়া বুদ্ধির জগৎকে পরবর্তী নানা লেখায় তিনি বিদ্ধ করবেন—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যার প্রসঙ্গ বারবার তাঁর লেখায় উঠে আসবে সেই বানিয়া বুদ্ধির জগৎকে ছায়ানট -এ উপস্থিত করে অভিনেতাদের জীবন যে সত্যিকারের নটের নয়—তারা নটের ছায়ামাত্র, কেবল বাজিকরের আঙ্গুলি হেলনে তাঁদের নট জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সেই চিত্র তিনি এই নাটকে আঁকলেন। ছায়ানট -এর অনেক অভিনয় হয়েছিল। শোভাসেন লিখেছেন “প্রচুর শো করেছিলাম আমরা”^২ ‘ছায়ানট’ দর্শকদের ভালো লেগেছিল নিশ্চয় কিন্তু ‘ছায়ানটে’ উৎপল দত্ত নিজের সৃষ্টি প্রতিভাকে প্রথম আবিষ্কার করলেন কিন্তু তার অভিমুখ তখনো খুঁজে পাননি। সেজন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হল ‘অঙ্গার’ পর্যন্ত। ‘ছায়ানটে’র পর তাঁর বিশিষ্ট নাট্য রচনা ও নাট্য পরিচালনা ‘অঙ্গার’। ‘অঙ্গার’ নাটক থেকেই উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের লক্ষ্য স্থির করে নিলেন। এই লক্ষ্য তাঁর পরবর্তী ৩০/৩৫ বছরের নাট্যকার নাট্যপরিচালকের জীবনে মোটের উপর অপরিবর্তিত থেকেছে। কখনো এর ইতর বিশেষ হয়নি তা নয় কিন্তু মূল প্রবণতার পরিবর্তন হয়নি। ‘অঙ্গার’ নানা কারণে উৎপল দত্তের নাট্য রচনাবলীর মধ্যে, নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে বিশিষ্ট। প্রথম কারণ উৎপল দত্ত বলেছেন এই নাটকে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর জীবনকে কোলকাতার বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন। মার্কসবাদী মতাদর্শে যে শ্রমিক হবে বিপ্লবের সম্মুখ বাহিনী সেই শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের কণ্ঠ এবং লড়াইকে উপস্থিত করে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের বাংলাদেশের রাজতৈকি পরিস্থিতিকে যেমন কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুগামী করে তুলতে সহায়তা করেছেন তেমনি হতবুদ্ধি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মনের সমর্থন লাভেও সমর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ এই মঞ্চ প্রয়োগ। মঞ্চ যে বাস্তবের বিভ্রম উৎপন্ন করে আলোছায়ার মায়ায় দর্শকদের সত্যবোধ উৎপাদন করা হল—তা বিস্ময়কর ভাবে বাস্তবতার উৎপাদক। মঞ্চসজ্জা এবং আলোর প্রয়োগ এই মঞ্চমায়া তৈরিতে অত্যন্ত কার্যকর হল। শোভাসেন বলছেন “এই প্রথম শ্রমিক জীবন উঠে এল ভারতীয় তথা বাংলা মঞ্চে।”^৩ ‘অঙ্গার’ নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা এবং সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন রবিশঙ্কর। তিনি উৎপল দত্তদের নাটক দেখতে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলেন পরের নাটকের সঙ্গীত তিনি করে দেবেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন “রবিবাবু ‘নীচের মহলে’র অভিনয় দেখতে এসে আমাদের দলটাকে ভালোবেসে ফেলেন এবং নিজ থেকে করমর্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—আমি আপনাদের পরের নাটকে সঙ্গীত দিতে চাই নেবেন? আমাদের বেড়ালের ভাগ্যে শিকে

ছেঁড়ার অবস্থা।”^৪

‘অঙ্গার’ বাংলার দর্শক চিত্তে ছাপ ফেলেছিল। আমরা প্রথম থেকেই টের পাচ্ছিলাম দর্শকের ভালো লাগার স্পর্শ। প্রতি শো-এর পর ন জন শ্রমিকের জন্য চোখে জল নিয়ে অভিভূত দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে সীট-এ বসে থাকতেন কিছুক্ষণ। এক একদিন কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে গেছে। শেষ দৃশ্য এতই হৃদয় বিদারক, তার সঙ্গে রবিশঙ্করের সঙ্গীত এমনই শ্বাস রোধকারী যে দর্শক নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন।^৫ ‘অঙ্গার’ নাটক প্রসঙ্গে শোভাসেন লিখেছেন “থিয়েটার হচ্ছে পরিচালকের হাতে একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম।”^৬ একথা সর্বাংশে সত্য। থিয়েটারের script নাটকের ছাপা অক্ষর থেকে অনেক আলাদা। অঙ্গার নাটকের রচনা পদ্ধতিও বেশ নতুন রকম। বড়াধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনার কথা শুনে রবি ঘোষ, নির্মলগুহ রায়, তাপস সেন সহ উৎপল দত্ত কয়লাখনি অঞ্চলে চলে যান। সেখানে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেন। নানারকম শব্দতরঙ্গ টেপ করেন। তারপর সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত কয়লাখনির ঘটনা জেনে ফিরে এসে তাকে মাথায় রেখে একটা পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাহিনী ও নাট্যক্রিয়া গড়ে তোলেন। ‘অঙ্গার’ নাটক গড়ে তোলার পর নাট্যকার উৎপল তাঁর নিজের সৃষ্টি শক্তিকে আবিষ্কার করলেন—নাট্য পরিচালক উৎপলও আরো সমর্থ পরিচালনার পরিচয় দিলেন। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা, আলোক সম্পাত, নাট্য অভিনয়, সঙ্গীত সবমিলিয়ে ‘অঙ্গার’ একটি সমগ্র সৃষ্টি হয়ে উঠলো। লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই নাটক ৩০০ রজনী অভিনয় করেছেন। ‘ছায়ানট’ থেকে ‘অঙ্গার’ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির নাটক। নাট্যকার উৎপল দত্ত এই নাটক থেকে যেন নিজের নাটক তৈরি করবার পথ পেলেন। পরবর্তীকালে ‘অঙ্গার’ নাটকের পরিণতিকে তিনি ‘ঠিক’ বলে মনে করেননি। তবু যে ধরনের ভাবনার প্রচার তাঁর লক্ষ্য ছিল ‘অঙ্গার’ নাটক থেকেই সে ধরনের নাটক লেখার সূচনা হল বলে আমরা মনে করতে পারি। শ্রমিকশ্রেণীর নায়কতা, অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটন, দেশ-বিদেশের ইতিহাসের ভিতর থেকে অত্যাচার ও পীড়নের কাহিনী তুলে এনে চিরকালের অত্যাচারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ-এসব কাজ ‘অঙ্গার’ থেকেই শুরু হল।

উৎপল দত্ত এ পর্যন্ত মোট কতগুলি নাটক লিখেছেন তার ঠিক হিসেব করা যায়নি। তবে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় যে তথ্যপঞ্জি সংকলন করেছিলেন তাতে দেখতে পাই—১৯৫৪ সালে প্রথম অভিনীত ‘ছায়ানট’ নাটকের সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উৎপল দত্ত ছোট ও বড় নাটক মিলিয়ে মোট ১১২টি নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে যাত্রাপালা, অনুবাদ নাটক বা বিদেশি নাটকের অনুসরণে রচিত নাটকও ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৯ থেকে ১৯৭০ এই এগার বছর এল.টি.জি পর্ব। এরপর এল.টি.জি ছেড়ে উৎপল দত্ত বিবেক নাট্যসমাজ তৈরি করেন। মিনার্ভায় এল.টি.জি-র

শেষ নাটক ‘লেনিনের ডাক’ ১৬.১১.১৯৬৯ তারিখে অভিনীত হয়। এরপর বিবেকনাট্য সমাজের নামে ‘শোনরে মালিক’ যাত্রাপালার অভিনয় হয় ঐ বছরই ৩১.১২.১৯৬৯ তারিখে। এরপর এল.টি.জির নামে মিনার্ভায় উৎপলদত্তের নাটক হয়নি। শোভাসেন লিখেছেন “২৮ শে জুলাই আমরা মিনার্ভা থিয়েটার পুরোপুরি ছেড়ে চলে এলাম।”^{১১} তখন কয়েকজন বিরোধী শিল্পী ‘অঙ্গার’ মঞ্চস্থ করবার তোড়জোড় করছিলেন। কিন্তু তাদের নামে মামলা হয় এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে পি.এল.টি নামে এঁরা প্রথম অভিনয় করেন ‘বর্গি এল দেশে’ ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির ‘মবলঙ্কর হল’-এ। এরপর কোলকাতায় পি.এল.টির নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় ‘ঠিকানা’। “২রা আগস্ট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে পি.এল.টির নতুন নাটক ‘ঠিকানা’র প্রথম শো হল।”^{১২} ১৯৭০ পর্যন্ত এল.টি.জি পর্বে উৎপলের লেখা নাটকের সংখ্যা ৪৬টি।^{১৩} পি.এল.টি পর্বে ১৯৭১ থেকে শুরু। ১৯৯৩ এ উৎপল দত্তের মৃত্যু পর্যন্ত তার কাল সীমা ২২ বছর। এল.টি.জি পর্বে লেখা ৪৬টি নাটকের মধ্যে এল.টি.জি ১৫টি নাটকের অভিনয় করে। অন্যান্য নাট্যদলের নামে কয়েকটি নাটক অভিনয়ের খবর জানা যায়। যেমন ‘শিল্পী মন’ দুটি নাটকের অভিনয় করেছে, ‘গন্ধর্ব’ ও ‘নান্দীরঙ্গ’ একটি করে নাটক করেছে, উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায়ের নামে তিনটি নাটকের অভিনয় হতে দেখা যায়। কোনো কোনো নাটক পরে পি.এল.টি অভিনয় করেছে। ‘থিয়েটার স্টাডি’ দুটি নাটক অভিনয় করেছে। ১৯৭১ থেকে পি.এল.টি পর্বে উৎপল দত্তের লেখা নাটকের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে ৬৬টি। এই পর্বে উৎপল দত্ত যেন সব্যসাচী নাট্যস্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পি.এল.টি পর্বে তাঁর নাটকের লক্ষ্য অনেক তীক্ষ্ণ, বস্তু পরিধি অনেক ব্যাপক। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের যেখানে যা কিছু শোষণ বঞ্চনার কথা পেয়েছেন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের যা কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁর কলম বলসে উঠেছে। উৎপলের ‘অঙ্গার’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘কল্লোল’ ‘তীর’, ‘মানুষের অধিকারে’ ইত্যাদির মতো বড়ো নাটকগুলির পাশে প্রায় ১৯টি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। এই পালাগুলির কোনো কোনোটি আবার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। যাত্রাপালাগুলি ছাড়াও তিনি প্রায় ৫৩টি ছোট নাটক—একাক্ষ পথনাটিকা লিখেছিলেন। এগুলির কোনো কোনোটি মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু ছোট নাটকগুলির মধ্যে ‘স্পেশাল ট্রেন’, ‘দিন বদলের পালা’, ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’, ‘দিন বদলের দ্বিতীয়পালা’, ‘জনতার কল্লোল’, ‘সত্তরের দশক’, ‘দৈনিকবাজার পত্রিকা’, ‘পাশপোর্ট’, ‘নয়া তুঘলক’, ‘বর্গি এল দেশে’, ‘ময়নাতদন্ত’, ‘চক্রান্ত’ প্রভৃতি পথনাটক বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। উৎপলের বিদেশি নাটকের অনুবাদ বা বিদেশি কাহিনী অনুসরণে লেখা নাটকের সংখ্যা যতটা জানা যায় ১৮টি। এদের মধ্যে প্রথম নাটক ‘মে

দিবস' গোর্কির 'মা' অবলম্বনে লেখা (১৯৬১)। ১৯৬২ সালে 'দি ম্যান হু কেম টু ডিনা'র অবলম্বনে তিনি লেখেন 'ভি.আই.পি' নাটক। এটির নামান্তর 'পুরুষোত্তম'। এরপর জর্জ বার্গার্ড শ-এর 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন' অনুসরণে লেখেন 'মধুচক্র'। ব্রেখট এর নাটক অনুসরণে লেখেন 'হিন্মৎবাই', 'নয়া জমানা', 'মুক্তিদীক্ষা'। মোট কথা অনুবাদ অনুসরণ, মৌখিক নাটক, যাত্রাপালা, পথনাটক, একাক্ষ নাটক সব মিলে উৎপলের সৃষ্টি সত্তারের তালিকা যথেষ্ট বড়ো। এই নাট্য সত্তারের মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর অভীষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন, জনচেতনা জাগরণের কাজ করেছেন, রাজনৈতিক শিক্ষা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করেছেন এবং সর্বোপরি যা কিছু জনজীবনের সাধারণ বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। উৎপল দত্তের যে নাট্যতালিকা সৌমেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাট্য রচনাবলীতে সংকলন করেছেন তার সবগুলি মুদ্রিত হয়নি। নীচে তাঁর নাট্য রচনাবলী অনুসারে নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

উৎপল দত্তের নাটকগুলি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক 'উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম থেকে অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত সংকলিত নাটকগুলিকে নিয়ে আমার আলোচ্য বিষয় সম্পন্ন হয়েছে। (অবশ্য এর আগে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'উৎপল দত্ত'র নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ' শিরোনামে কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।) উৎপল দত্ত 'মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর নাটক সমগ্রের প্রথম খণ্ডের প্রকাশও দেখে যেতে পারে নি। ১৯৯৩ সালে তাঁর অকাল প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই তাঁর নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল— "রচনাবলীর প্রতিটি খণ্ডেই উৎপল বাবুর কাজের মিশ্রধারার পরিচয় থাকবে এবং নাটগুলি (এবং পালা ও একাক্ষ/পথনাটক সমূহ অবশ্যই) যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত হবে।"^{১০} অবশ্য নাট্যকারের এ ইচ্ছা পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হলেও ষষ্ঠ খণ্ড থেকে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

নাটকসমগ্রের প্রতিটি খণ্ডে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন নাটক ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি নাটকই একটা বিশেষ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তত্ত্বের দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়েছে উৎপলের নিজস্ব জীবনদর্শন। নাটক যদি জাতির জীবনের প্রতিরূপ হয়ে থাকে, তাহলে সে জীবন সে জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করতে পারে না। বিশেষ করে নাটকের জীবন কোন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবন নয়, এ এক বৃহত্তর সামাজিক জীবন। উৎপল দত্ত এ সামাজিক জীবনকে ও সমাজ-রাজনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে।

উৎপল দত্ত নাটকসমগ্রের প্রথম খণ্ডে মোট দশটি নাটক-নাটিকা স্থান পেয়েছে। এগুলির

मध्ये “चारटि पूर्णाङ्ग नाटक ॥ छायानट, अङ्गार, मेघ, फेरारी फौज , दुटि यात्रापाला –राईफेल ० सीमांतु एवं स्पेसाल ट्रेन, द्वीप, घुम नेह, मे-दिवस पथ नाटिका गुच्छ।”^{११}

‘छायानट’ नाटकटिहै बांग्लाय रचित उंपल दत्तोर प्रथम पूर्णाङ्ग मौलिक नाटक। रचनकाल १९५८ ख्रीष्टाब्द। प्रथम प्रकाश -१३७५ वङ्गाब्द। प्रथम अभिनय १०इ डिसेम्बर १९५८ ख्री. लिटल थियेटार ग्रुप कर्तृक। नाटकटिर विषयवस्तु कोलकातार चलचित्र जगत्। चलचित्र जगत्तेर नेपथ्ये ये कदर्य, स्पर्धपर कार्य-प्रणाली सबसमय चले থাকे तारइ निर्भूर उथान पतनके केन्द्र करे ए नाटकटि गडे उठेछे।

‘अङ्गार’ नाटकटिर रचना काल १९५९, प्रथम प्रकाश ० एकइ बहुरे। प्रथम अभिनय ३१शे डिसेम्बर, १९५९ ख्रीष्टाब्दे मिनार्भा थियेटारे। नाटकटिर विषयवस्तु राणिगङ्ग-आसानसोल अण्णलेर कोलियारिर धूसर पृथिवी। आगे ए नाटकेर नाम छिल ‘कालोहीरे’। से समये लिटल थियेटार ग्रुपेर सभापति चित्तु चौधुरी नाम बदले ‘अङ्गार’ नाम करण करेन।^{१२} वडाधेमो, कोलङ्क, चिनाकुडि- एर खनि दुर्घटनाके केन्द्र करे नाटकटि रचित। ‘अङ्गार’ नाटकटिर शततम रजनीते वडाधेमो कयलाखनिर सेइ सातजन मजदुरके मण्ण एने संवर्द्धना देओया ह्येछिल। श्रमिक जीवन निये लेखा एरकम नाटक प्रयोजनाय निश्चइ चमक छिल किन्तु तार चेये बेशि छिल श्रमिक जीवनेर प्रति दरद। उंपल दत्त अवश्य परवर्तीकाले ए नाटकेर ट्राजिक परिणति निये सञ्चुष्ट छिलेन ना। यাইहोक अङ्गार उंपलेर एकटि नामकरा नाटक एवं नाट्य प्रयोजना।

‘फेरारी फौज’ नाटकटि १९७१ साले रचित एवं एकइ साले नाटकटिर प्रथम प्रकाश। प्रथम अभिनय २८ शे मे १९७९ ख्रीष्टाब्दे मिनार्भा थियेटार कर्तृक। ए नाटकेर विषयवस्तु याट बहुर आगे, पूर्व बांग्लार एक मफसल शहर, सन्नासवादेर पश्चात्पट। भारतवर्षेर सशस्त्र स्वाधीनता आन्दोलनेर आख्यान रयेछे ए नाटके। अतीतके दिये वर्तमानेर द्वान्द्विक विश्लेषणे उंपल दत्त सर्वदाइ आस्थाशील छिलेन। से आस्था रहइ कथामुख ए नाटकटि।

‘मेघ’ नाटकटिर प्रथम संस्करणेर प्रकाश १९७३ सालेर नभेम्बर मासे। नाटकटिर विषयवस्तु सम्पूर्णु भिन्न गोट्रेर। एटि एकटि अतिगूट मनस्तात्रिक नाटक येखाने प्रख्यात लेखक समरेश सान्याल, मानसिक रोगेर विचित्र अध्यासे एकेरपर एक खून करे चले, यदि ० सेटा कल्लनाय। ए नाटकटि उंपल दत्त परिचालित प्रथम एक काहिनी चित्र-यार विज्ञापनेर शिरोनाम छिल— ‘एकटि निखूत खुनेर काहिनी।’^{१३}

‘राईफेल’ नाटकटिर प्रथम संस्करण १९७९ वङ्गाब्दे विजया दशमीते प्रकाशित।

‘राईफेल’ बांग्ला देशेर सेइ सब दुःसाहसी सर्वत्यागी, अमर मानुषेर काहिनी—बृटिश साम्राज्यवादेर

শৃঙ্খলপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে সর্বস্ব পণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের দুর্গম কন্ট্রাকীর্ণ পথ বেছে নিয়েছিল- যারা দিয়েছিল তাদের সব।”^{১৪}

‘সীমান্ত’ যাত্রাপালাটির (প্রথম সংস্করণের) প্রথম প্রকাশ ১৩৯১ সালের মাঘ মাস। ‘ঘুমনেই’, ‘মে-দিবস’, ‘দ্বীপ’, ‘স্পেশাল ট্রেন’—এগুলি হল পথনাটিকা। প্রথম তিনটি একত্রে একটি নাটক সংকলন রূপে প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। মে-দিবস নাটিকাটি ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ অবলম্বনে রচিত। ‘স্পেশাল ট্রেন’ পথ নাটিকাটি ১৯৬১ সালে হিন্দমোটর কোম্পানীর হরতাল ও শ্রমিক সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে রচিত। অধিকার ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক আন্দোলনই এ নাটকের মুখ্য বিষয়।

উৎপল দত্ত নাটকসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ছোটো-বড়ো মিলে মোট এগারটি নাটক-নাটিকা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি যাত্রাপালা রয়েছে। কয়েকটি একাক্ষিক, অনুবাদ নাটকও রয়েছে। বাকিগুলি স্বতন্ত্র গোত্রের অন্তর্গত।

নাটক সমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই স্থান পেয়েছে ‘পুরুষোত্তম’ নাটকটি। স্বয়ং উৎপল দত্তের পরিচালনায়, লিটল থিয়েটার কর্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬২ সালে। “মিনার্ভায় অভিনীত সেই ভি.আই. পি. এখানে ‘পুরুষোত্তম’ হয়েছে।”^{১৫} এ নাটকটি কাউফ ম্যান ও হার্ট -এর ‘দ্য ম্যান হু কেম টু ডিনার’ অবলম্বনে রচিত হয়।

‘মানুষের অধিকারে’ ঐতিহাসিক নাটকটির প্রথম প্রকাশ ‘গন্ধর্ব’ পূজা সংখ্যায় এবং পরে ‘এপিক থিয়েটার’ অষ্টম সংখ্যায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। “নাটকের মূল কাঠামো ১৯৩১ সালের মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যের স্কটসবরো মামলা। শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা কিভাবে কালো মানুষদের বিদ্বেষ ঘৃণা ও নির্যাতন করতো তারই নির্মম চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন।”^{১৬} লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রয়োজনায় ও উৎপল দত্তের অভিনয় এবং পরিচালনায় ‘মানুষের অধিকারে’ প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৪ ই জুলাই ১৯৬৮ সালে। বিষয়বস্তু এবং নিহিত বিশ্বাসের জোরে -এ নাটক হয়ে ওঠে সর্বকালীন নিপীড়িত মানুষের নাকট। বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী এ নাটক বিচারের নাটক-অধিকার রক্ষার নাটক।

‘রাতের অতিথি’ (হাঁড়ি ফাটিবে) নাটকটি বিদেশী নাটকের বঙ্গীয়করণ। থিয়েটার ওয়ার্কশপ তাদের জন্ম লগ্নে ‘হাড়ি ফাটিবে’ এই নামে মঞ্চস্থ করেছিল নাটকটিকে। এতে রয়েছে সমাজের নামী দামী প্রতিষ্ঠিত মানুষদের দিয়ে তাদের পাপ এবং স্বলনের স্বীকৃতি আদায়ের বন্দোবস্ত। আগাথা ক্রীস্টির গল্প অনুসরণে নাটকটি রচিত।

‘মধুচক্র’ নাটকটিও বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ এবং একটি পুনর্বিচারের নাটক। আর এই

পুনর্বিচার পৃথিবীর আদিমতম পেশাকে নিয়ে। প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্গার্ড শ' রচিত 'মিসেস ওয়ারনেস প্রফেশন' নাটকের অবলম্বনে 'মধুচক্র' নাটকটি রচিত। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে 'গন্ধর্ব' শারদ সংখ্যায় নাটকটির প্রথম প্রকাশ। বার্গার্ড শ'-এর বিদেশী চরিত্রগুলি এ নাটকে বাঙ্গালী পোশাকে নতুন রূপে হাজির হয়েছে।

উৎপল দত্ত যে বিপ্লবী নাট্যচিন্তার একটা ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন তারই একটা অন্যতম নিদর্শন হল 'কল্লোল' নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৫ খ্রী:। উৎপলের পরিচালনায় এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় এ নাটকের প্রথম অভিনয় দেখা যায় ২৯ শে মার্চ ১৯৬৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে। প্রথম প্রকাশ গ্রন্থম (এপ্রিল, ১৯৬৮)/পত্রিকা সিণ্ডিকেট কর্তৃক।^{১৭} যুদ্ধ জাহাজ খাইবার ও বোম্বের তলোয়ার নৌবাহিনীর ব্যারাকে ১৯৪৬ সালে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'কল্লোল' নাটক রচিত। নাট্যকার এ নাটকে ইতিহাসের চাইতে জনগণের উৎসাহ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবী যোদ্ধাদের মহান চরিত্র এবং ভারতীয় সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতীকরূপে চিত্রায়িত করেছেন -সমাজ দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ হিসেবে।

ব্রিটিশের পাশবিক শক্তি ও চক্রাঙ্কের ফাঁদে পা দেন ভারতের অহিংস পন্থী নৌবিদ্রোহের নেতাগণ। আবার অহিংস পন্থী এসব নেতাদের নির্লজ্জ আতাতের ফলে বিদ্রস্ত হয় নৌবহরের নৌবিদ্রোহ। শোভাসেন জানিয়েছেন উৎপল এ নাটকের খসড়া করেছিলেন দশ বছর আগে। কিন্তু সেটা নাটক হিসেবে জমেনি। নাটক হিসেবে গড়ে তোলার পর এ নাটকের প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি রাশিয়ান নাটক 'দি ওশান'-এর কথা মনে ছিল। তাকে মাথায় রেখেই এর প্রযোজনা হয়। এ নাটকের জন্য উৎপল দত্তকে কারাবরণ করতে হয়।

বোর্টন ব্রেখট্ রচিত (ইংরাজী অনুবাদের নাম 'মাদার ক্যুরাজ') নাটকের অনুসরণে উৎপল 'হিন্মৎবাই' রচনা করেন। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ সালে এপিক থিয়েটার পত্রিকায় ১ম, ২য় ও ৩য় তিনটি ধারাবাহিক কিস্তিতে। ব্রেখট্-এর 'মাদার ক্যুরাজ' নাটকটিকে উৎপল দত্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাজিয়ে নিয়েছেন। নাটকের হিন্মৎবাই-মাদার ক্যুরাজের মতোই মা এবং ফেরীওয়ালী। মুঘল সম্রাট ও হিন্দু রাজের বিরোধের মধ্যে এ নাটক বাড়তি মূল্য পায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মাত্রাটিতে। শোভা সেন স্বয়ং এ নাটকে হিন্মৎবাই চরিত্রের অভিনয় করেন।

'প্রফেসর মামলক' নাটকটি অনুবাদ নাটক। এর পটভূমি ১৯৩২ সালের জার্মানি। ফ্রিড্রিশ ভোল্ফ-এর ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমিকায় নাৎসী অমানবিকতার বীভৎস চিত্র উন্মোচিত হয়েছে

নাটকে। নাৎসীরা কুৎসিত জাতি বিদ্বেষকে ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, বুদ্ধিজীবীদের অকেজো করে দেয়। ১৯৬৪ সালে কোলকাতাতে ও যে দাঙ্গার প্রকোপ লক্ষ্য করেছেন উৎপল দত্ত তাতে তাঁর মনে ক্রোধ জন্মে উঠেছিল। ‘প্রফেসর মামলক’ হল সেই ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

আর উইনশ-এর ‘বেরি দ্য ডেড্’ নাটকের মৃত সৈনিকদের আভাসে এ যাত্রাপালাটির শুরু হয়। “শ্রম, আনুগত্য এবং জীবন দিতে আহ্বান জানান হয় যাদের তারা সাধারণ মানুষ—অন্যদিকে তলে তলে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যায় অন্যপক্ষে। কারখানার মালিক, দালাল আর শ্রমিকরা এ নাটকের চরিত্র।”^{১৮}

‘নীলকণ্ঠ’, ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’, ‘সমাধান’ এগুলির মধ্যে ‘সমাজ তান্ত্রিক চাল’ পথনাটিকা এবং বাকি দুটি একাঙ্কিকা। “রাজনৈতিক ভাবনায় দর্শনের কমিটমেন্টে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিফলনের ইস্তাহার কেন্দ্রিক নাটক অনেক লিখেছেন উৎপল দত্ত। ... বিশেষ ঘটনা ভিত্তিক নাটক এসব। এগুলিকে একাঙ্ক নাটকও বলা যায়।”^{১৯} উক্ত নাটিকা তিনটি ঠিক এরকম গোত্রেরই একাঙ্ক নাটক।

‘নীলকণ্ঠ’ হল সেইসব মানুষের কাহিনী যারা নর্দমার ‘অন্ধকারে ম্যানহোলের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের যত আবর্জনা সব সাফ করে। পেটের দায়ে তারা জীবন বাজি রেখে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে একাজ করে থাকে। আর আশে-পাশে দাবা-খেলুড়ে মানুষজন নিশ্চিত্তে তখন দাবা খেলা উপভোগ করে। সমাজের এরকম এক নির্মম বাস্তব কাহিনী চিত্রিত হয়েছে এ নাটিকায়।

‘সমাজতান্ত্রিক চাল’ নাটিকাটি চীন-ভারতের যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। এতে এমনই একটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, সেটি হল—খেতে না পাওয়া নিঃস্ব মানুষদের কাছে এ যুদ্ধের কোন মূল্য নেই। এ থেকেই বোঝা যায় যে উৎপল দত্ত চীন-ভারতের তৎকালীন যুদ্ধকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

‘সমাধান’ নাটিকাটিও ব্রেখ্ট-এর নাটকের অনুবাদ। চীন-ভারতের যুদ্ধের বিশেষ একটি পর্ব নিয়ে নাটকটি রচিত। এতে মার্কসবাদ শিক্ষা আলোচনা, ক্ষুদ্র অন্যায ও বৃহৎ অন্যায, মানুষ আদতে কী? এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে।

উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে—দিল্লী চলো, নীলরক্ত, অজেয় ভিয়েতনাম, তীর, ত্রুশবিদ্ধ কুবা ও লৌহমানব (একাঙ্কিকা) নাটকগুলি। সব কটি নাটকেই রয়েছে তার যুগের সার্থক প্রতিফলন। শুধু তাই নয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চিত্রকল্প সহ প্রতিটি নাটকই হয়ে উঠেছে জীবন্ত। “আলোচিত সংকলনের প্রতিটি নাটকই রাজনৈতিক নাটক। রাজনৈতিক

নাটক, কিন্তু শ্লোগানের ক্লিশে কোনো নাটকই ক্লান্ত নয়।”^{২০}

এ খণ্ডে আগের দুটি খণ্ডের তুলনায় রচনার ক্রম পর্যায়ে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের দুটি খণ্ড যেমন নাটক দিয়ে শুরু হয়েছে, এতে কিন্তু সে রকম নেই। এখানে দেখা যায় পালা নাটক দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হচ্ছে। ‘দিল্লী চলো’ ও ‘নীলরক্ত’ এ দুটি যাত্রাপালা।

‘দিল্লী চলো’ পালা নাটকটি ১৯৭৩ সালের ১৫ই আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয় পপুলার লাইব্রেরী কর্তৃক এবং ১৯৭১ সালে (প্রায় দু’বছর আগেই) লোকনাট্য কর্তৃক অভিনীত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের বিবরণ রয়েছে এ নাটকটিতে। “দিল্লী চলো’ অহিংস বিপ্লবের সার কথা তুলে ধরেছে, গান্ধীবাদী সত্যগ্রহের বিপ্রতীপে।”^{২১}

‘নীলরক্ত’ যাত্রাপালাটি ১৩৭৯ সালের ১লা আষাঢ় জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং ‘ভারতী’ অপেরা কর্তৃক ১৯৭০ সালে এ পালা প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম রক্তক্ষয়ী অধ্যায় নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত এ নাটকটি সশস্ত্র কৃষক প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

‘অজেয় ভিয়েৎনাম’ নাটকটি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯৬৬ সালের ৩১শে আগস্ট লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯৬৭ সালে এ নাটকের জার্মান অনুবাদ ‘উনবেসিগবারেস ভিয়েৎনাম’ পূর্বতন গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানির রস্টকহিত ফোলকস্ থিয়েটারে অভিনীত হয়। ‘অজেয় ভিয়েৎনাম’ নাটকটি ভিয়েৎনামে মার্কিনী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের ভূমিকায় রচিত হয় ‘তীর’ নাটক। ‘তীর’ উৎপল দত্তের বহু বিতর্কিত নাটক। “তিনি নিজে এ নাটককে পরবর্তীকালে ‘শোচনীয় ভ্রান্তি’ হিসেবে স্বীকার করে নিলেও এ প্রজন্মের নাট্য কর্মীদের স্বার্থে জরুরী ছিল নাটকটির মুদ্রণ। কারণ উৎপল দত্তের আদ্যন্ত রাজনীতি সম্পৃক্ত নাট্য জীবনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দলিল ‘তীর’।”^{২২} ১৯৬৭ সালে ১৬ ডিসেম্বর ‘তীর’ নাটক প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে।

কিউবার (কুবা) তরেয়ানা শহরে ১৯৫৮ এর ইস্টারে চে-ফিদেল পস্ট্রী উভুখানের এক শ্বাসরুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে ‘ক্রশ বিদ্ধ কুবা’ নাটকটিতে। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর, ১৯৬৭- জানুয়ারি, ১৯৬৮ যুগ্ম সংখ্যায় ‘এপিক থিয়েটার’ পত্রিকায়। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করে অভিনেত সংঘ। এ নাটকটি পোলিটিকাল থ্রিলারের আদলে নির্মিত।

উৎপল দত্তের অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হল ‘লৌহমানব’, যেখানে তাঁর মধ্যে অনুরণিত

হয় বিশ্বের সর্বাধুনিক চিন্তাগুলি। নাটকে দেখা যায় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কুড়িতম অধিবেশনের পর নিকিতা খ্রুশ্চভের নেতৃত্বে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে স্তালিন ‘ব্যক্তিপূজার’ বিরুদ্ধে সক্রিয় আক্রমণের ঝড় ওঠে। স্তালিনের জামানায় যারা স্তালিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তারাই আবার রাতারাতি ভোলপাণ্টে খ্রুশ্চভপন্থী হয়ে যান। শুধু তাই নয় সে সময়ে যারা যথার্থ সমাজতন্ত্র রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতে থাকেন। নাটকে -এ মিথ্যা ‘বালসিয়েভ-মামলা’; ইতিহাস বিকৃতির এক নির্মোহ বিশ্লেষণ।

‘লৌহমানব’ নাটকটি বর্তমান খণ্ডের এক মাত্র একাঙ্ক নাটক। এর রচনা কাল ১৯৬৪ সাল। প্রথম অভিনয় ১৯৬৫ সালের ৭ই নভেম্বরে স্তালিনের জন্মদিনে। সে সময় উৎপল জেল হেপাজতে ছিলেন।^{২০}

ব্যক্তি হিসেবে উৎপল দত্ত নিজে ছিলেন আবেগপ্রবণ। আর সে কারণেই তাঁর নাটকের অনেক চরিত্র যুক্তির বদলে আবেগের পথে হেঁটেছেন। নাটক তো আসলে আবেগময় বিশ্লেষণ এবং যুক্তির সংমিশ্রিত শিল্প। তাই আবেগ এবং যুক্তি নাটকের ক্ষেত্রে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের চতুর্থ খণ্ডে যে নাটকগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল— ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’, ‘লেনিনের ডাক’, ‘চাঁদির কৌটো’, ‘রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া’, ‘যুদ্ধংদহি’ এবং ‘মৃত্যুর অতীত’ (একাঙ্কিকা)। এ খণ্ডের প্রতিটি নাটকই নাট্যরসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। ভূমিকা অংশে এ খণ্ডের নাটক সম্পর্কে জোছন দস্তিদার বলেছেন— “নাটকীয় সংঘাত, ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে আশ্রয় করে উনি এগিয়েছেন বটে কিন্তু কোনটাই ইতিহাস হয়ে উঠেনি।”^{২১}

‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’ একটি পালা নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ সালে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। রচনা ও প্রথম অভিনয় ১৯৬৯ সালে। মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে।

‘বীভৎস অত্যাচারের স্বরূপ উন্মোচনের’ এই পালাটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস নীতি ও সশস্ত্র বিপ্লবের মূল দ্বন্দ্বগুলি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয়েছে। একই সঙ্গে এ নাটক ইতিহাসের অনালোকিত কতিপয় সত্যকে তুলে ধরেছে।^{২২}

‘লেনিনের ডাক’ নাটকটির প্রথম প্রকাশ ‘এপিক থিয়েটার’-এ লেলিন শতবার্ষিকী সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯৭০ সালের পয়লা মে। ১৯৬৯ সালের ১৬ নভেম্বর এল. টি. জি কর্তৃক নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে।

এ নাটক সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই নাটকের ভূমিকা অংশে জানাচ্ছেন—

“১৯১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে একাধারে বিদেশী ফৌজ, দিশী প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতফৌজ এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের অসমসাহসিক সংগ্রাম ও জয়লাভকে এই নাটকে তুলে ধরার প্রয়াস হয়েছে।”^{২৬}

‘চাঁদির কৌটো’ নাটকটি প্রহসনধর্মী রচনা, জন গলস্‌ওয়ার্ডির ‘দ্য সিলভার বকস্’ অবলম্বনে এ নাটক রচনা করেন উৎপল দত্ত। তাঁর নাট্যকার জীবনের গোড়ার দিককার রচনা এ নাটকটি। নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিটি কর্তিত হওয়ার কারণে এবং মুদ্রিত গ্রন্থটি না পাওয়ার কারণে প্রথমে কোন পত্রিকায় এ নাটকের প্রকাশ সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৬১ সালে শ্রীগুরু লাইব্রেরী এ নাটকের প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক ‘চাঁদির কৌটো’ নাটকের প্রথম প্রযোজনা, ‘বিচারের বাণী’ নামে।

‘রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া’ নাটকের মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। কপি থেকে বর্তমান পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কর্তৃক নাটকটি প্রথম প্রকাশিত। এ বিষয়ে সৌভিক রায় চৌধুরী উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে বলেছেন— “শিল্পীমন কর্তৃক অভিনীত ‘রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া’ এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে।”^{২৭}

এক সময়ে ডাচ উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়ায় ছয়ের দশকের শেষভাগে উদ্ভূত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উগ্রজাতীয়তাবাদী, বামপন্থী, অতিবাম ও দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারের নিরন্তর সংঘর্ষ এবং দম বন্ধ করা সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করেছিল। সে ঘটনাই নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে নাটকটিতে। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে রাষ্ট্রপীড়নের কঠোরতাকে। সেনাবাহিনী- মিলিশিয়া-আইন ব্যবস্থার মিলিত রোষে নাটকটি তুলে ধরেছে এক গূঢ় তদন্ত আখ্যান।

‘যুদ্ধং দেহি’ নাটকটি ১৯৬৮ সালের ২৪ শে নভেম্বর (মতান্তরে ১১ ডিসেম্বর) প্রথম মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। সম্ভবত এই নাটকটিও মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে জানুয়ারি মাসে।^{২৮} যুদ্ধ ব্যবসায় রাষ্ট্রনেতাদের কদর্য মুনাফাবৃত্তি কীভাবে উন্মোচিত হয় তারই দলিল ‘যুদ্ধং দেহি’ নাটকটি। নাট্যকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর সীমান্ত সংঘাতকে তীব্র কষাঘাত করেছেন।

‘মৃত্যুর অতীত’ নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারি। প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। আরউইন শ’-এর ‘বেবি দ্য ডেড’ নাটক অবলম্বনে এ নাটকটি রচিত হয়। “আধুনিক তাত্ত্বিকদের ভাষায় এটিকে বলা যেতে পারে Subversive black Comedy. পুঁজিবাদী সমাজে মৃতদেহও যে মূলধনে পরিণত হতে পারে, মৃত্যুতেও যে শোষণের ইতি ঘটেনা,

এই নির্জলা সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে তীব্র শ্লেষাত্মক নাটিকাটির নীতিদীর্ঘ পরিসরে।”^{২৯}

উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র পঞ্চম খণ্ডে মোট এগারোটি নাটক-নাটিকা সংকলিত হয়েছে। এগুলি হল—‘ঠিকানা’, ‘টিনের-তলোয়ার’, ‘ব্যারিকেড’, ‘মহাবিদ্রোহ’ (টোটা), ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’, ‘মুক্তিদীক্ষা’, ‘কাকদ্বীপের এক মা’, ‘ইতিহাসের কাঠগোড়ায়’, ‘কংগোর কারাগারে’ এবং ‘সভা নামিক’। এর মধ্যে পাঁচটি নাটক, দুটি পালা ও চারটি নাটিকা।

উৎপল দত্ত যখন মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন তখন তাঁর শিল্পী জীবনের এক পর্বাস্তুর শুরু হয়েছিল। নিজের তৈরি করা নাট্যদল ও নিজের অধিকারে থাকা নাট্যমঞ্চের বাইরে এসে নতুন করে এক চলার পথ গড়ে নিতে হয়েছিল তাঁকে। সে পথে তাঁর কৃতিত্বের পদচিহ্ন বিধৃত হয়েছে বর্তমান নাট্যখণ্ডে।

‘ঠিকানা’ নাটকে ‘বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী’ বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে ২রা আগস্ট ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’ কর্তৃক নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। প্রথম প্রকাশ ‘এপিক থিয়েটার’ পত্রিকায়- মে দিবস, ১৯ তম সংখ্যায়। নাটকটির রচনাকাল জানা যায়নি। বাংলা দেশের সামরিক বাহিনীর কারাগারে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি কিছু সাধারণ মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মদানের কাহিনী ঠিকানা নাটকটি। ১৯৭১-এ বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। নাটকের ঘটনাকাল ২২-২৫ এপ্রিল ১৯৭১, মাত্র চার দিন।

উৎপল নাট্যে তথা আধুনিক বাংলা নাট্যের ক্রোশফলক ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে জুন মাসে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রচিত এ নাটকে বাংলা রঙ্গ মঞ্চের সাহসী পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। প্রথম অভিনয় ১৯৭১ সালের ১২ আগস্টে রবীন্দ্রসদনে। “‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের বিষয় হল ইংরেজ সরকারের বর্বরোচিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) বাংলা নাট্য আন্দোলনকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছিল, এর বিরুদ্ধেই কলকাতার একটি নাট্যদল শানিয়ে তোলে তাদের ‘টিনের তলোয়ার।’”^{৩০} থিয়েটারের মধ্যে নির্দেশক ও অভিনেতা অভিনেত্রী সম্পর্ক, নাটকের সঙ্গে প্রযোজনা-পরিবেশনার সম্পর্ক, থিয়েটারের বাইরে থিয়েটারের সঙ্গে দর্শকদের সম্পর্ক, থিয়েটারের সঙ্গে সমকালীন বাস্তব ও বিশেষ রাজনীতির সম্পর্ক এ চারটি সম্পর্ককে ধরে থিয়েটারের অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকার তাঁর ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে।

‘সূর্যশিকার’ নাটকের প্রথম অভিনয় ১৯৭১ সালের ১৩ই আগস্টের একাডেমি মঞ্চে।

প্রথম প্রকাশ-‘সত্যযুগ’ পত্রিকায়, শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৮২ বঙ্গাব্দে। শোভাসেন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, সত্যম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্তির অনুরোধে উৎপল দত্ত ‘সমুদ্র শাসন’ পালা লিখেছিলেন। “সূর্য শিকার’ আসলে ‘সমুদ্র শাসন’ পালার মঞ্চভাস্য।”^{১১}

‘ব্যরিকেড’ নাটকটি কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। ১৯৭৩ সালে ১লা মে গ্রন্থাকারে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পিপলস লিটল থিয়েটারের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয় কলামন্দিরে।

‘ইয়ান পেটার্সন রচিত ১৯৩৩-এর বার্লিনের রোজনাচা ‘আমাদের রাস্তা’ ‘উনসেরেস্ত্রাসে’ - থেকে নাটকটির বিষয় বস্তু গৃহীত হলেও সব দিক থেকে তা হয়ে উঠেছিল তৎকালীন নির্বাচনের প্রহসন এবং ফ্যাসিস্ট আদলে ইন্দিরা গান্ধীর উত্থানের নাট্যভাস্য।”^{১২} ত্রিশের দশকের জার্মানির ঘটনা এ নাটকের পটভূমি।

উৎপল দত্তের ‘টোটা’ নাটক নামান্তরিত ও পরিমার্জিত হয়ে ‘মহাবিদ্রোহ’ নামে প্রযোজিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি ‘টোটা’ নামে প্রথম অভিনীত হয় নয়াদিল্লীর আইফ্যাক্স মঞ্চে পি.এল.টি. কর্তৃক। প্রথম প্রকাশিত হয় এপিক থিয়েটারে নভেম্বর সংখ্যায় ১৯৭৫ সালে। ‘মহাবিদ্রোহ’ নামে নাটকটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এ নামে প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮৫ সালের ৬ই ডিসেম্বরে রবীন্দ্র সদনে। নাটকটির বিষয় ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। গরু ও শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত এনফিল্ড রাইফেলের টোটা বা কার্তুজ ভারতে হবে দাঁতে কেটে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু - মুসলমান সিপাহীদের আবেগ এতে আহত হয়। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কীভাবে বারুদের স্তম্ভে পরিণত হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী এক প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সে সময় তারই কাহিনী বর্ণিত এ নাটকে। পূর্ব জার্মানি সফর করে পি.এল.টি. এর প্রযোজনায় এ নাটকের অভিনয় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে এবং উৎপলের প্রতিভা দেশের বাইরেও স্বীকৃতি পায়।

উনিশ শতকের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পটভূমিকায় ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’ নাটকটি লেখা হয়। উৎপল দত্তের পরিচালনায় ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’ প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, বিশ্বরূপায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে মে-জুন মাসে।

‘পারি কমিউন’ উৎপলের একটি প্রিয় বিষয়। এই পারি কমিউনের ইতিহাসকে ভিত্তি করেই উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন তাঁর ‘মুক্তিদীক্ষা’ পালাটি। ১৯৭৭ সালের ১২ই আগস্ট এই পালাটি প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে ‘এপিক থিয়েটারে নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যায়। এ পালাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সুন্দরবন এলাকার কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় একাঙ্কনাটক ‘কাকদ্বীপের

এক মা' রচিত হয়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক একাঙ্কিকাটি ১৯৭৯ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়।^{৩০}

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় 'ইতিহাসের কাঠগোড়ায় একাঙ্কিকা নাটকটি।' প্রথম প্রকাশ ০৯.০৫.১৯৬৭ তে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

নাটিকাটির বিষয় কংগোর মুক্তি সংগ্রাম। ৯ই মে ১৯৬৭ সালে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অভিজাত সমাজের মুখোশ পড়া মানুষের পঙ্কিলতা 'সভ্যনামিক' (একাঙ্কিকা) -এর বিষয় বস্তু। ১৯৬৭ সালের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হয় জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের পঞ্চম খণ্ডে যে সব নাটিকা সংকলিত হয়েছে সেগুলির কোনটিরই রচনাকাল জানা যায়নি।

উপল দত্ত নাটকসমগ্রের ষষ্ঠ খণ্ডে মোট ১০টি নাটক সংকলিত হয় তারমধ্যে আটটি মৌলিক নাটক এবং দুটি অনুবাদ নাটক। সূচিপত্র অনুযায়ী নাটকগুলির নাম — 'নয়াজমানা', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'লেনিন কোথায়?' 'এবার রাজার পালা', 'তিতুমীর', 'স্তালিন-১৯৩৪', 'বাংলা ছাড়া', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'শৃঙ্খল ছাড়া' ও 'কৃপাণ'। এগুলির বেশির ভাগই সত্তরের দশকে রচিত। তার মধ্যে তিনটি নাটকের চরিত্রলিপিতে রয়েছেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন এবং তাঁদের সহকর্মীরা। "মার্কসবাদ এখানে শুধু অবলম্বন নয়, সরাসরি বিষয় (শৃঙ্খল ছাড়া, লেনিন কোথায়, স্তালিন -১৯৩৪)।"^{৩৪}

তবে পূর্বের পাঁচটি নাট্যখণ্ডে যে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে এসে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। উৎপলবাবুর কাজের মিশ্রধারার পরিচয় এবং নাটগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো -এর কোনটাকেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ হিসেবে এ খণ্ডের 'নিবেদন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অবশিষ্ট নাটক, পালা, একাঙ্ক ও পথনাটক যেগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজাতে গেলে কমপক্ষে আরও ছয়টি-সাতটি খণ্ডের প্রয়োজন যা সাধারণ নাট্যপ্রেমী পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে। ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম নাটক 'নয়াজমানা'- এটি উৎপলের অনুবাদ নাটক। বের্টোল্ট ব্রেখ্টের 'Die Tage Der Commune' (দ্য ডেজ অফ দ্য কম্যুন) নাটকের বঙ্গানুবাদ। রচনাকাল জানা যায়নি। প্রথম প্রকাশ -১৯৬৬ -৬৭ সালে (সম্ভবত)।^{৩৫} পি.এল.টি 'কমিউনের দিনগুলি' এ নামে নাটকটির অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করেছিল ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

মঞ্চে? ১৮৭১-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে 'নয়াজমানা' রচিত হয়।

'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি অনেক উন্নতমানের এবং সাড়া জাগানো। সারা বিশ্বের মাপকাটিতে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম।^{১৩} রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে যখন প্রশাসন, শাসকদল, বিত্তবান শ্রেণী একযোগে এ রাজ্যে এক নৈরাজ্যের অবাধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল তখন শহর কোলকাতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে এ নাটকে। নাটকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের রূপ উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন উৎপল দত্ত। ফ্যাসিবাদী শাসক গোষ্ঠীর রূপ উদ্ঘাটন করেছেন এ নাটকে। পি.এল.টি. কর্তৃক 'দুঃস্বপ্নের নগরী' প্রথম প্রযোজিত হয়েছিল ১৬ই মে ১৯৭৪ সালে কলামন্দিরে। 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার ১০-২, '৭৯-৮০ সংখ্যায় নাটকটি প্রথম ছাপা হয়েছিল।^{১৪} তবে নাটকটি কখনো স্বতন্ত্র নাটক আকারে প্রকাশিত হয়নি।

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং অভাবনীয় বিচ্যুতি- 'লেনিন কোথায়' নাটকের মুখ্য বিষয়। প্রথম খসড়ায় নাটকটির নাম ছিল 'লেনিন ভেঙেছে বাঁধ'। মহামতি লেনিনের অতিনাটকীয় জীবনকথা এবং দুনিয়া কাঁপানো মহান নভেম্বর বিপ্লবের ঘটনা উৎপলের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল, তাই তাঁর নাটকে লেনিনের আবির্ভাব ছিল অনিবার্য। দেশের বিশেষ দুর্দিনে, কংগ্রেসী সন্ত্রাসে জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলিতে লেনিনকে স্মরণ করেছেন নাট্যকার।^{১৫} পি.এল.টি কর্তৃক মিনার্ভা মঞ্চে এ নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে। প্রথম প্রকাশ মে-জুন ১৯৭৯ সংখ্যায় 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়।

'এবার রাজার পালা' নাটক একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার। ব্রেখ্ট-এর 'Der Aufhalttsame Aufstiegdes Arturo Ui' (দ্য রেসিসটিব্ল রাইজ অফ আর্টুরো উই) নাটক অবলম্বনে 'এবার রাজার পালা' রচিত। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪৬ সালে উত্তরবঙ্গের এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের পটভূমিতে নাটকটি রচিত হয়েছে। "বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার আগমনী, জরুরি অবস্থার অন্তিম লগ্নে', ৭৭-এর ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ১৯৪৬ এর ডিসেম্বর মাসে উত্তরবাংলার মেচগীর রাজ্যের পীঠস্থান গ্রাম। একটি ভ্রাম্যমান যাত্রা দলের মুখ্য চরিত্রকে সামনে রেখে ভারতীয় রাজনীতির ঘণ্য, কূটনৈতিক আবরণ আবারও খসে পড়ল এ নাটকে।"^{১৬} নাটকটির প্রথম প্রকাশ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯৭৭ সালে জুন মাসে। প্রথম অভিনয় ৬ই জানুয়ারি ১৯৭৭ সালে, কলামন্দিরে।

'তিতুমীর' নাটকে উৎপল দত্ত এক বৃহত্তর সন্ধান করেছেন ঐতিহাসিক সত্যের আলোয়। ইতিহাসের এক বিতর্কিত নায়ক তিতুমীর ওরফে মীর নিশার আলীকে উৎপল দত্ত পরম যত্নে ব্রিটিশ বিরোধী প্রজাবিদ্রোহের পুরোধা পুরুষের সম্মানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ওয়াহাবি আন্দোলন

মুসলিম মৌলবাদকে সামনে রেখে এগিয়ে চললে ও হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও ইসলাম ধর্মবিরোধী বিভিন্ন ফতোয়ার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তিতুমীরের নেতৃত্বে ক্রমশ গরীব হিন্দু মুসলমান প্রজাদের মিলিত ক্ষোভ কীভাবে সংগ্রামের রূপ লাভ করল তারই বিশ্লেষণ রয়েছে ‘তিতুমীর’ নাটকে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২১ শে জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে, রবীন্দ্র সদনে। সর্বপ্রথম সংকলিত হয় জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ‘উৎপল দত্তের নির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে। প্রকাশ কাল ১৯৮৪ খ্রীঃ।^{১০}

মাত্র দশ দিনের রুশ বিপ্লবের পরে বিপ্লবের সাফল্যকে রক্ষা করা, লেনিনের ‘বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে’র স্বপ্নকে সফল করা, দেশের প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শকে সারাবিশ্বের ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্তালিনের যথাসম্ভব প্রচেষ্টাই ‘স্তালিন-১৯৩৪’ নাটকের বিষয় বস্তু। এ নাটকটি যেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শ ভিত্তিক ব্যর্থ বিপ্লব, সফল বিপ্লব ও বিপ্লব সংরক্ষণ বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ট্রিলজি। “দেশের বিঘ্নসংকুল অবস্থায় সোভিয়েতের এবং স্তালিনের জীবনের সংকটময় পরিবেশকে স্মরণ করে পরিব্রাণের সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে চাইলেন উৎপল।”^{১১} এ নাটকে। নাটকটির প্রথম প্রকাশ ‘এপিক থিয়েটার’ ১-৬, ১৯৮৩ সংখ্যায়। প্রথম অভিনয় ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৯ সালে অ্যাকাডেমিতে।

দারিও ফো রচিত ‘অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ অব অ্যান অ্যানার্কিস্ট’ নাটকের বাংলা রূপান্তর ‘বাংলা ছাড়া’ নাটকটি। প্রথম অভিনয় ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮০ তারিখে, পি.এল.টি. কর্তৃক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। হাসির মোড়কে এ নাটকে পরিবেশিত হয়েছে নিষ্ঠুর রাজনৈতিক সত্য। ‘বাংলা ছাড়া’ নাটকটি “নকশাল আমলের, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি.পি.আই (এম) এবং সি.পি.আই (এম. এল.) -এর ভিন্নধর্মী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের” বিষয় নিয়ে রচিত।^{১২}

‘দাঁড়াও পথিকবর’ নাটকটি উৎপলের নাটকের জগতে একটি দ্রোণফলক। রচনাকাল ১৯৭৯ সালের মে মাস। প্রথম প্রকাশ ‘এপিক থিয়েটার’ পত্রিকায় ৮-১২/’৮১ সংখ্যায়। প্রথম অভিনয় পি.এল.টি কর্তৃক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে। উৎপলের এ নাটক লেখার প্রয়োজন সম্বন্ধে মহেন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—

“প্রয়োজন ছিল। উৎপল বাবু মাইকেলকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। দোষগুণে উনিশ শতকের এই যুগন্ধর প্রতিভাকে তিনি মানবিক এবং দেশপ্রেমিক-মূল্যবোধে নূতনভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাকে তিনি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে।

মাইকেলের মধ্য দিয়ে উৎপল বাবু একটা গোটা যুগের অস্থিরতা, কাল চেতনা, পরস্পর বিরোধিতা, স্বাদেশিকতার উন্মেষ—এককথায় সামগ্রিক রূপরেখার দ্বন্দ্বিক চরিত্রটি ধরতে চেষ্টা করেছেন।”^{৪০}

মহেন্দ্রগুপ্তের এ বক্তব্যের মধ্যেই নাটকটির নাট্যবিষয় পরিস্ফুট হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় স্বৈরতন্ত্রী ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে বাডেন রাজ্যের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং পেটি বুর্জোয়ার নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তায়, শ্রমিকশ্রেণীর ভ্রান্তিতে, বুর্জোয়া ও সামন্তদের মিলিত শক্তিতে বিপ্লবীবাহিনীর পরাজয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে শৃঙ্খল ছাড়া নাটকটিতে। নাটকটি কালমার্কসের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে প্রায়োজিত হয়েছিল। বাডেন বিপ্লবের পটভূমিকায় বিশ্বের মেহনতি মানুষের নেতা ও গুরু মার্কসকে স্মরণ করা হয়েছে এনাটকের মাধ্যমে। এ নাটক কখনো স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশ ‘নন্দন’ পত্রিকায় ১৩৯০ বঙ্গাব্দে (বর্ষঃ বাইশ, সংখ্যা : একাদশ-দ্বাদশ, ফাল্গুন-চৈত্র)। প্রথম অভিনয় ১৬ ই নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পি.এল.টি.-র প্রয়োজনায় রবীন্দ্রসদনে।^{৪৪}

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রতি উৎপল দত্তের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ছিল। ‘কৃপাণ’ নাটকটি ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রচিত। পাঞ্জাবের গদরপন্থীদের সাহায্যে রাসবিহারী বসু, শচীন সান্যালদের নেতৃত্বে উত্তরভারতে ১৯৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের অভ্যুত্থান এ নাটকের বিষয়বস্তু। ‘কৃপাণ’ নাটকের রচনাকাল জানা যায়নি। নাটকটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। শোনা যায় পি.এল.টি -এ নাটকের মহলা শুরু করেছিল কিন্তু কোন অনিবার্য কারণে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। উৎপল দত্তের হস্তাক্ষরে নাটকটির পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, মহলার সময়কার অভিনেতাদের কপি থেকে দৃশ্যগুলি সংকলিত করে বর্তমান পাঠটি মুদ্রিত হয়েছে।^{৪৫}

উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র সপ্তম খণ্ডে মোট ১০টি নাটক সংকলিত হয়েছে। মূলত উৎপলের অন্ত্যপর্বের মঞ্চনাটকগুলিই সংকলিত হয়েছে এতে। বিষয়গত বিস্তারে, প্রাসঙ্গিকতা ও গভীরতার সঙ্গে সামগ্রিক থিয়েটারের অনুগামী শিল্পনিদর্শন হিসেবে সপ্তম খণ্ডে সংকলিত নাটকগুলি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এ খণ্ডে সংকলিত নাটকগুলির নাম যথাক্রমে — ‘মীরকাশিম’, ‘মহাচীনের পথে’, ‘আজকের সাজাহান’, ‘অগ্নিশয্যা’, ‘দৈনিক বাজার পত্রিকা’, ‘নীল সাদা লাল’, ‘একলা চলোরে’, ‘জনতার আফিম’ ও ‘বণিকের মানদণ্ড’।

সপ্তম খণ্ডের প্রথম নাটক ‘মীরকাশিম’। সম্ভবত এটিই উৎপলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পঞ্চাশের দশকে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজ্যবিরোধী নীতি এবং রাজ্য

সরকারের জনবিরোধী দস্যুতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য মীরকাশিমের মতো ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল। সে কারণেই মীরকাশিমের ঘটনাবলি সময় ও নাটকীয় জীবন উৎপল দত্তকে প্রলুব্ধ করেছিল। শুধু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছেন তাই নয়, দেশী রাজা-জমিদার-বানিয়াদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও মীরকাশিমের প্রতিবাদ কীভাবে অব্যাহত ছিল তার কথাই বর্ণিত হয়েছে এ নাটকে। নাটকটির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক হদিশ পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয় ১৯৫৩ সালের আগেই লেখা হয়েছিল। প্রথম প্রকাশ ‘নন্দন’ পত্রিকায় ১৪০২ বঙ্গাব্দে শারদ সংখ্যায়। নাটকটির অভিনয় সম্পর্কেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি।^{৪৬}

মহাত্মা নর্মান বেথুনের বিপ্লবী জীবন এবং জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তথা তাঁর মহৎ কৃতিত্বই ‘মহাচীনের পথে’ নাটকের বিষয়বস্তু। সম্ভবত ১৯৭৯ সালে চীন ভ্রমণের সময় শিচিয়াজুয়াং শহরে নর্মান বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল এবং বেথুন সংগ্রহশালা দেখে উৎপল অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং বেথুনকে নিয়ে নাটক লেখেন। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৮৪ সালের ২৯ শে জুন তারিখ পাইওনীর পাবলিশার্স থেকে।

উৎপলদত্তের চিত্তক্ষেত্রের বিস্তার এবং অস্তর্দৃষ্টির গভীরতা খুব নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে ‘আজকের সাজাহান’ নাটকে। এটি তাঁর একটি ব্যতিক্রমী নাটক। এ নাটকটি প্রথম প্রযোজিত হয় ১৯৮৫ সালে ২০ এপ্রিল, পি.এল.টি. কর্তৃক অ্যাকাডেমি মঞ্চে। প্রথম মুদ্রণ (প্রকাশ) ‘আজকাল’ পত্রিকায় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে, শারদ সংখ্যায়।

‘আজকের সাজাহান’ কেবলমাত্র কোন একজন বাতিল হয়ে যাওয়া অভিনেতার করুণ কাহিনীই নয়, রূপোলি পর্দার আড়ালে চলচিত্র জগতের নির্মম শোষণ আর নিলজ্জ ভ্রষ্টাচারে, পাশাপাশি দুটি শিল্প প্রজন্মের নগ্ন ব্যবধান এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতার একটা বাস্তব গল্প বর্ণিত হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার চাপে পড়ে মানুষ কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সে বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে।

রামমোহন ও তাঁর সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে ‘অগ্নিশয্যা’ নাটকটি রচিত হয়। পি.এল.টি. এ নাটকের প্রথম প্রযোজনা করে ১৯৮৮ সালের ২৭ শে নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে। নাটকটির প্রথম প্রকাশ ‘আজকাল’ পত্রিকায়, শারদ সংখ্যা, ১৪০০ বঙ্গাব্দে।

‘দৈনিক বাজার পত্রিকা’ নাটকের মুখ্য বিষয় হল বাজারি খবরের কাগজের দৈনিক মিথ্যাচার এবং অন্দরমহলের নানারকম পঙ্কিলতা। নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ‘নন্দন’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। প্রথম অভিনয় পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায় ১৯৮৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি মঞ্চে। এটি মৌলিক নাটক নয়। কনস্টানতিন সিমোনভের ‘দ্য রাশিয়ান কোয়েশেন’

নাটকের সরোজ দত্ত কৃত বাঙ্গানুবাদের রূপান্তর। সরোজ দত্তের অনুবাদের নাম ছিল ‘সাংবাদিক’। ১৯৭৬ সালে উৎপল দত্ত সেই অনুবাদের সমন্বয়পযোগী রূপান্তর করলেন ‘দৈনিক বাজার পত্রিকা’।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, ঘটেছিল আধুনিক যুগের উন্মেষ। তার প্রভাব ফরাসি দেশের সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপে, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার মতো দেশগুলিতে। সেই ফরাসি বিপ্লবের দু’শ বছর পূর্তি উপলক্ষে ফরাসি পতাকার রঙের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে উৎপল রচনা করলেন ‘নীল সাদা লাল’ নাটকটি। নাটকটির রচনাকাল ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম অভিনয় ১৯৮৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায়। প্রথম প্রকাশ ‘আজকাল’ পত্রিকায়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের একটু আগে-পরের সময়কালের পটভূমিকায় ‘একলা চলোরে’ নাটক রচিত হয়। নেহেরু-প্যাটেল-জিনাদের চক্রান্ত, ইংরেজদের শীতল পরোচনা, গান্ধীবাদের দ্বন্দ্ব, বাংলায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক ও দেশভাগের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর একক পদযাত্রা এবং মহাত্মা গান্ধীর নিহত হবার ঘটনা—এ সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নাটকটির বিষয়বস্তুতে। নাটকটির প্রথম প্রকাশ -‘আজকাল’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে। প্রথম অভিনয় ১৯৮৯ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে, পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায়।

রুমানিয়া চেসেস্কু সরকারের পতন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা দখলের পটভূমিকায় রচিত হয় ‘লাল দুর্গ’ নাটকটি। এ নাটকের রচনা কাল - ১৯৯০ সালের ২২ শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট। প্রথম প্রকাশ ‘আজকাল’ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যায় ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে। প্রথম অভিনয় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বরে পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায় রবীন্দ্রসদনে।

‘জনতার আফিম’ নাটকের প্রথম প্রকাশকাল ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ। ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (শারদীয় সংখ্যায়)। প্রথম অভিনয় পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। “ ‘জনতার আফিম’ লেখা হয়েছিল উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ছিন্নমস্তা রাজনীতির পটভূমিকায়। ধর্মীয় আফিমের নেশায় উন্মত্ত মানুষের অন্ধ উন্মাদনার বিপক্ষে ক্ষুরধার ব্যঙ্গের আঘাত করা হয়েছে এ নাটকে। এ নাটক ধর্মের মোহকে সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ।”^{৪৭}

‘বণিকের মানদণ্ড’ নাটকটির রচনাকাল জানা যায়নি। প্রথম প্রকাশ- ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে ‘আজকাল’ পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায়। প্রথম অভিনয়—পি.এল.টি.-এর প্রযোজনায় ১৯৯৫ সালের ২৯শে মার্চ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। বাংলার মঞ্চস্তরের পটভূমিতে ওয়ারেন হেস্টিংস এর দেশি-

বিদেশি অনুগতদের পাশাপাশি মহারাজা নন্দকুমার, বর্ধমানের মহারাণীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে এ নাটকটিতে। ইংরেজ আমলের ইতিহাসের বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে নাটকের কাহিনীতে।

সত্তরের দশকেই উৎপল দত্তের বেশিরভাগ পালানাটক রচিত হয়েছিল। তাঁর নাটক সমগ্রের অষ্টম খণ্ডে সংকলিত নাটকগুলির সবগুলিই পালা নাটক এবং এগুলির রচনাকাল ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।^{১৮} এ সংকলনটিতে মোট চারটি পালা সংকলিত হয়েছে। ‘ভুলি নাই প্রিয়া’, ‘জয়বাংলা’, ‘ঝড়’ এবং ‘মাও-ৎসে-তুং’ কোনটিরই রচনাকাল জানা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা হয় যে, প্রতিটি পালা মঞ্চস্থ হবার বছরে বা তার ঠিক দু’চার মাস আগে রচিত হয়েছিল। সে হিসেবে ধরা যায় যে, পালাগুলির প্রথম অভিনয় এবং রচনা কাল একই।

নাটকসমগ্রের অষ্টম খণ্ডের প্রথম পালা নাটক হল ‘ভুলি নাই প্রিয়া’ শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ এর বাংলা রূপান্তর এ নাটকটি। শেক্সপিয়ারের চতুর্থ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এল.টি.জি. কর্তৃক ‘ভুলিনাই প্রিয়া’-এর প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভা মঞ্চে ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৪ সালে। মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার মুর্শিদাবাদের প্রেক্ষাপটে এ পালা রচিত হয়। এ নাটক মূল নাটকের মতোই হিংসায় উন্নত সামন্ততান্ত্রিক জগতের পটভূমিকায় শাস্ত্রত মানব ধর্ম পালন করতে যাওয়ার ট্রাজেডি। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশভাগের আগে হিন্দু-মুসলমানের পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, শুভবুদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ‘জয়বাংলা’ পালা নাটকটি রচিত। “পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম বাঙালি বিদ্রোহ এবং নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি গেরিলাদের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনি এই পালার বিষয়।”^{১৯} পালাটির মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ ২০০৯ সালে জুন মাসে। প্রথম অভিনয় ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদন মঞ্চে লোকনাট্যের প্রযোজনায়।

মনীষী হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র বিপ্লবী কর্মজীবনের পটভূমিকায় ‘ঝড়’ নাটকটি লেখা হয়। পালাটি প্রথম সংকলিত হয় ‘উৎপল দত্ত’র নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ’ ষষ্ঠ খণ্ডে, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক এর প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ‘ঝড়’ পালাটির দুটি মঞ্চরূপ একটি হল ‘আগন্তুক’, যার প্রথম অভিনয় নাট্যরঙ্গ কর্তৃক অ্যাকাডেমি মঞ্চে ২০০৫ সালের ৭ই মে তে। অন্যটি হল ‘ঝড়’, যার প্রথম অভিনয় ২০০৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি,

(অগ্নীশ, কৃষ্টি, নবব্যারাকপুর)।

নাটকসমগ্রের অষ্টম খণ্ডের সর্বশেষ পালার নাম ‘মাও-ৎসে-তুং’। তরণ অপেরা কর্তৃক পালারটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় নন্দনে ১৯৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। প্রথম প্রকাশ ‘নন্দন’ পত্রিকা, শারদ সংখ্যায় ‘যাত্রা নাটক’ অভিধায় ১৪০১ বঙ্গাব্দে। মাও-ৎসে-তুং ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সামনে রেখে চীনের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দৃশ্যে-দৃশ্যে গ্রথিত হয়েছে এ নাটকে। তার পাশাপাশি দেখানো হয়েছে এক অদ্ভুত রোমান্টিক দৃশ্যকল্পের মেলা, যাকে বলা হয় ‘রেভোলিউশনারী রোমান্টিসিজম’ বা মুক্তির স্বপ্নের আলোয় ভরা প্রেম। উৎপলের নাট্যসৃজনের যাদুস্পর্শে মহামানব মাও-ৎসে-তুং ও যেন প্রেমের ফাঁদে, বাৎসল্যের ফাঁদে পড়া এক কাছের মানুষে পরিণত হয়েছে। নাটক সমগ্রের অষ্টম খণ্ডের মুখবন্ধে অসিত বসু বলেছেন—

“এ সংকলনের সব পালাতেই উৎপল দত্তের তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধ রাজনীতিবোধ— তাঁর পরিচিতি বিশ্লেষণী শ্লেষ এবং হাস্য করুণ রসে ভরা। উদ্বেগ ভরা দৃশ্য সংস্থাপনের জাদুকরি শক্তি বর্তমান। তবুও উৎপল দত্তের সৃজনে ‘প্রেম’ যে কত রঙে কত রসে তাঁর নাট্যক্রিয়াকে সজীবতা দিয়ে মানবতা দিয়ে ছেয়ে থাকে যেখানে উৎপল দত্ত আর সবার থেকে পৃথক, অনন্য।”^{৫০}

উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদের বিষয় ও প্রকৃতি : প্রতিনিয়ত যে অন্যায়-অত্যাচার শোষণ বঞ্চনা সমাজ জীবনে ঘটে চলে নাট্যকার উৎপল দত্ত তাকে দৃশ্যরূপ দিয়েছেন। সমকালীন কোন সমস্যাকে নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে তুলে আনেন তাঁর নাটকে। কালের অভিঘাতকে কাহিনীর আধারে কুশীলবদের মুখের সংলাপের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন। উৎপল তাঁর নাটকে সমাজ ও মানবতার বিরোধী অশুভশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা জাগরণের কাজ করে গেছেন।

নিপীড়িত শোষিত মানুষের সুপ্ত চেতন্যের জাগরণের উদ্দেশ্যে নাট্যকার দেশ-বিদেশের সেইসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই নাটকরচনা করেছেন যে বিষয়গুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রতিবাদী ভাবনা।

নাট্যকার নাটকের বিষয়ের মধ্যে কখনো দুটি পক্ষ তৈরি করে চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন। চরিত্রগুলি কখনো কখনো সরাসরি প্রতিবাদ করেছে, শ্লোগান দিয়েছে বা জনতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ দেখিয়েছে।

Sufferings বা দুঃখ ভোগের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমেও নাট্যকার প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। দেখা যায় এ দুঃখ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরিত্রের প্রতি দর্শকমনের সহানুভূতি জেগে ওঠে এবং যে চরিত্র বা পরিস্থিতির জন্য অসহায় চরিত্রটি দুঃখ ভোগ করছে সেই চরিত্র বা পরিস্থিতির

বিরুদ্ধে দর্শকমনে ক্ষোভ বা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে।

খল চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমেও নাট্যকার যথাযথ ভাবে প্রতিবাদকে দেখাতে পেরেছেন। খল চরিত্রটি একটি নির্দিষ্ট সমাজের সদস্য, তার দ্বারা সমাজের নানা রকম ক্ষতি, অন্যায় অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার ফলে দর্শকমনে বা পাঠক মনে সে চরিত্রের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং এসব চরিত্রের উপর ত্রোখ উদ্ভিক্ত হওয়ার ফলে মানুষের শুভ বুদ্ধি জেগে ওঠে। অর্থাৎ খল চরিত্র নির্মাণের দ্বারাও নাটকের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হয়তো জনমানসে প্রতিবাদী চেতনার উদ্দীপণের জন্যই উৎপল দত্ত বিভিন্ন নাটকে খল চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি অন্যায় অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমাকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

নাটকের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বা উপস্থাপন রীতি পদ্ধতির মাধ্যমেও নাটকের প্রতিবাদকে দেখাতে পারা যায়। পোশাক, পরিচ্ছদ, চালচলন, সংলাপ বলার পদ্ধতি, আলো, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদী ভাবনার উপস্থাপনা হতে পারে। এসব বেশির ভাগই প্রতীকী হয়ে ওঠে। সংলাপ বলার একরকম পদ্ধতি আগে ছিল। এখন অন্যরকম হয়েছে। ‘জুলিয়াস সিজার’ নাটকের প্রযোজনা করতে গিয়ে উৎপলদত্ত সিজারকে ফ্যাসিস্ট হিটলারের পোশাক পরিয়েছিলেন। এতে ‘জুলিয়াস সিজার’ থেকে ফ্যাসিবাদী হিটলার –এর একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার অত্যাচারী চরিত্র এবং তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রূপ ফুটে উঠেছে।

এছাড়া মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, ন্যায় নীতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন নাট্যকার। একক মানবের মানবিক প্রতিবাদও রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শগত প্রতিবাদ, শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এমনকি নাট্যচরিত্রের বক্তব্যের ভঙ্গিতে, আঙ্গিকে এবং বিদ্রূপের মাধ্যমেও উৎপলের লেখনী প্রতিবাদী চেতনার বীজ বপণ করেছে। উৎপল দত্তের নাটকসমগ্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পবিত্র সরকার লিখেছিলেন—“উৎপলদত্ত সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূল বস্তু করে তুলেছিলেন।”^{১১} এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নাট্যবস্তু নির্বাচন করেছেন। এই কাজে তিনি দেশে-বিদেশে যেখানেই মানুষের সংগ্রামের কাহিনী পেয়েছেন, তা থেকেই নাটক নির্মাণ করেছেন। উৎপল দত্ত লিখেছিলেন—“নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার।”^{১২} এই কথার সূত্রে পবিত্র সরকারের কথা উদ্ধার যোগ্য।

“দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম, জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নানা আর্থিক অধিকার ও মানবিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম —সবই

তাঁর কাছে এক ও অব্যাহত সংগ্রামের নানা স্থানিক ও কালিক বিস্ফোরণ, যে-কোনো সংগত সংগ্রামই অন্য ন্যায্য সংগ্রামের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে, তা শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।”^{১০}

উৎপল দত্তের গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলির মাধ্যমে উক্ত প্রতিবাদের ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হল। তবে এ আলোচনায় নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাট্যবিষয়কে আবর্তন করেই সে নাটকের প্রতিবাদের প্রকৃতি বিবর্তিত হয়েছে।

অঙ্গার : উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’ নাটকটি কয়লাখনির শ্রমিকদের মর্মান্তিক আত্মহত্যার চিত্র। কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবনের শোষণ, বিড়ম্বনা, বঞ্চনা দুর্বিসহ বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ নাটকের উপাদান।

এ নাটক রচনার প্রেক্ষিত সম্পর্কে শোভাসেন লিখেছেন—নাটকটি লেখার কিছুদিন আগে বড়াধেমোর কয়লাখনির দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছিল। একুশ দিন খাদে আটক থাকার পর নয় জন শ্রমিক খনি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার আগেই ঘটে গিয়েছিল চিনাকুড়ির দুর্ঘটনা। সেখানে খাদে আশুন ধরে গিয়েছিল। বড়াধেমোতে পাহাড় ধসে গিয়ে বেরোবার পথ আটকে যায়; মালিক খাদ রক্ষা করবে বলে খনির মধ্যে জল ঢুকিয়ে দেয়। রবি ঘোষ বড়াধেমো কয়লা খনির বিস্তারিত বিবরণ এনেছেন। তাঁর কাছে সব শুনে উৎপল দত্ত, তাপস সেন ও দলের আরও কয়েক জন কয়লাখনি চলে যান। সেখানে সরেজমিনে সব দেখে শুনে, নানারকম শব্দ তরঙ্গের টেপ করে নিয়ে আসেন। এই ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত ‘অঙ্গার’ নাটক লেখেন। শোভা সেনের কথা থেকে জানা যায় পনের দিনে এই নাটক লেখা হয়েছিল। নাটকের আবহসঙ্গীত রচনা করেছিলেন রবিশঙ্কর। এই প্রথম শ্রমিক জীবন নাটকের মধ্যে রূপায়িত হল। নাটকের ভূমিকায় উৎপল জবাবদিহি করতে গিয়ে লিখেছেন। ‘এই নাটকে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে—এই ধরণের অভিযোগ শুনেছি।’ এ থেকে বোঝা যায় তখন এরকম অভিযোগ উঠেছিল। ‘অঙ্গার’ কয়লাখনির শ্রমিকের জীবনের বাস্তবচিত্রকে নাটকের আকারে তুলে ধরেছে। কোলকাতা নগরীর শিক্ষিত শ্রেণীর দর্শকদের কাছে এই জীবনকথার বাস্তবতা অত্যন্ত কঠোর ভাবে রূপায়িত হয়েছিল। শোভা সেনের কথা থেকে দেখতে পাই প্রতি ‘শো’-এর পর অভিভূত দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে সীটে বসে থাকতেন। কেউ কেউ নাকি অজ্ঞানও হয়ে গেছেন। এমনই রূঢ় বাস্তবতার প্রতিপাদন হয়েছিল এই নাটকে। রবি শঙ্করের সঙ্গীত এমনই স্বাসরোধকারী যে তা দর্শককে নাট্যবস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে তুলত।

নাটকের শুরুতেই শোষণ-বঞ্চনার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে নাট্যকার শ্রমিকদের বাসগৃহগুলির অবস্থাকে ইঙ্গিত করেছেন। —“শেলডন কোলিয়ারি প্রদত্ত শ্রমিক-কর্মচারীর বাসগৃহগুলির কোন

স্বকীয়তা নেই; তারা সারবন্দী সৈনিকের মতন বৈশিষ্ট্য হীন, ক্লান্ত, বৃদ্ধ।”^{৫৪}

বাসগৃহগুলির ভিতরে যারা থাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আর অজানা কিছু থাকতে পারে না। শীতের রাতের একটু আগুন তাপানোর জন্য এক জনৈক ব্যক্তি দু’টুকরো কয়লা নিতে এলে দু’ জন ওয়ার্ডার এসে তাকে যে রকম ভাবে অপমান করে—এ থেকে অনুমিত হয় কয়লাখনি কর্তৃপক্ষ কতটা নির্মম ও অর্থলোভী। বিনুর মা লোকটির ওরকম অবস্থা দেখে মর্মান্বিত হয় এবং বলে—“শীতের রাতে—কয়লার দেশ এটা- অমন করে মারে?”^{৫৫}

কয়লা খনির শট্‌ফায়ারার দীননাথ (দীনু) বিনোদকে (বিনু) শট্‌ফায়ার শেখায়। শট্‌ফায়ার করতে গিয়ে বিনু ভুল করে, তাই দীনু তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু মালিকপক্ষ নানা রকম অব্যবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে খনির মধ্যে। এরকম অব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে শ্রমিকদের জীবনসংশয় হতে পারে। খনির ভিতর এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিনু—“গ্যাস জমেছে। মেথেন গ্যাস। শালার ব্যাটা শালা কোম্পানির ফ্যানগুলো মেরামত করবে না। গ্যাস জমছে আর জমছে। দেদার। বাতি দেখে বুঝতে হয় গ্যাস আছে কিনা। কোন মিটার কিনবেনা শালা ফিরিঙ্গির বাচ্চারা।”^{৫৬}

মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা কোনদিনও ভাবে না, বরং বিপদের আশঙ্কা দেখলে, যেখান থেকে এ আশঙ্কা তাকেই কৌশলে অস্বীকার করে। নাটকে দেখা যায় তিনবছর আগে যখন রাখানগর কোলিয়ারি ফেটে গিয়েছিল তখন থেকে খনির ইলেকট্রিশিয়ান বৈদ্যনাথের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। খাদের মধ্যে বৈদ্যনাথ ফ্যান সারাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে চারিদিক অন্ধকার। অতিকষ্টে সাতদিন পর যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সে জানতে পারে মালিকপক্ষ কোর্টে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, রাখানগর কোলিয়ারিতে বৈদ্যনাথ বলে কোন লোক কস্মিনকালেও ছিলনা। ওদের খাতায় বৈদ্যনাথ বলে কোন লোকের নামই নেই। তাই রাখানগরে কেউ মরেনি।

বৈদ্যনাথ নিজের জীবন্ত অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। হাসপাতালে তার স্থান হল তিন মাস। তার পর সনাতন নাম নিয়ে শেলডন কোলিয়ারিতে কাজ নিল। এভাবেই বৈদ্যনাথের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। খনির শ্রমিকদের এভাবে প্রতারণা করে মালিকপক্ষ।

তাছাড়া খনির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে থাকতে ফুসফুসের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। সেজন্য তারা গলা ছেড়ে গান পর্যন্ত গাইতে পারে না। কালো থুথু বের হয়। কয়লাখনির দুর্ঘটনায় শট্‌ফায়ারার দীননাথের মৃত্যু তার সহকর্মীদের সচেতন করে তোলে।

শ্রমিকপক্ষের উকিল আদালতে প্রমাণ করেন যে এ কেসে কোম্পানী দুটি অপরাধে

অপরাধী। প্রথমত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গ্যাস জমতে দিয়ে তারা খনিটাকে একটা বারুদের গাদায় পরিণত করেছে এবং বিনা ল্যাম্পে খনিতে শট্‌ফায়ারিং করতে পাঠিয়ে দীননাথ মুখুজ্যের ও তার সহকারী কালু সিংকে তারা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছে।

দ্বিতীয়ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া এড়াবার জন্য এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে নিজেদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তারা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। কেউ যাতে সেটা শনাক্ত করতে না পারে সেজন্য তারা নির্ধূর ভাবে মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে দীন মুখুজ্যের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে সমস্ত কয়লা খনির শ্রমিকরা আন্দোলন করে। দেওয়ালে পোস্টার স্টেটে দেয়।

দীনুর মৃত্যুর পর থেকেই কোম্পানী জানত যে খাদে গ্যাস জমেছে তবু তারা সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফ্যানগুলি কমজোর হয়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই, বালি ছড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে, কয়লার গুঁড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো হলদে নিবু নিবু দেখা যায় মাত্র।

আন্দোলনকারী শ্রমিক-জনতার সম্মুখে খনির শ্রমিক কুদরৎ মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—

“কারণ খরচা ওরা করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রোডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে যাট সত্তর করতে পারলে আরো ভালো হয়। আর সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে, তাদের জীবনরক্ষার কী ব্যবস্থা ওরা করেছে বলুন? ওরা ইংরেজ, তাই ভারতীয় মজুরদের প্রাণের মূল্য নেই। মরে গেলেও সৎকার হয় না। মুখ খেঁতলে, উলঙ্গ করে দেহ ফেলে দেয় দূরে।”^{৫৭}

শ্রমিকদের নেতা বিনোদ শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে মালিকপক্ষের কাছে দাবী পেশ করে যে, খনির নীচে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস বের না করলে কেউ খনিতে নামবে না। শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকে।

মালিকপক্ষ তবু শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য জুলুম করে। মি. দত্ত বলেন যে, শ্রমিকরা বে-আইনি ভাবে কাজ বন্ধ করেছে এবং এর ফল ভালো হবে না। শ্রমিক কুদরৎ মালিকপক্ষের এরকম জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সে বলতে থাকে “শুনুন বন্ধুগণ—১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১৪৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুরকে উপরে তুলে আনতে হবে। কোম্পানি সে আইন মানেনি, তাই আপনারা নিজের থেকে বেরিয়ে এসে কোন বে-আইনী কাজ করেননি।”^{৫৮}

সুবেদার মহাবীর সিং শ্রমিকদের গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে। প্রহার করে তাদের খনির নিচে

নামতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে। মহাবীরের এই অসভ্য আচরণে বিনোদ খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। —“কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমি শটফায়ারার, বারুদ ঘেটে জীবন কাটাই। আপনাদের এই বীভৎস অত্যাচারের জবাব....”^{৬৯} অর্থাৎ অত্যাচারের জবাব মহাবীরদের একদিন পেতেই হবে। সকল শ্রমিকরা বিনুর কথায় উৎসাহ পেয়ে কেউ গাঁইতি কুড়োচ্ছে, কেউ শাবল, কেউবা এক খণ্ড কয়লা। অর্থাৎ সবাই প্রতিবাদের চেতনায় জেগে উঠে। মহাবীর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

হরতাল প্রায় দেড় মাস কেটে যায়। অভাবের তীব্রতায় শ্রমিকরা অস্থির হয়ে ওঠে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কোম্পানির সুবেদার মহাবীর সিং ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ দত্ত। তারা দু'জনে এসে শ্রমিকদের প্রলোভন দেয়। মালিকদের চক্রান্তে অনেকে গ্রেপ্তার হয় আবার অনেকে অর্থের প্রলোভনে পড়ে বিক্রি হয়ে যায়।

বিনু শ্রেণীসচেতন শ্রমিকনেতা হলেও এ জায়গায় অসহায় হয়ে পড়ে। কেননা আন্দোলনের কৌশল তার আয়ত্তের বাইরে। তাছাড়া নিদারুণ অভাবের জ্বালায় দিশেহারা হয়ে এবং মায়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য একরকম অভিমানের সুরেই সে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে খনি গর্ভে নামে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নিচে আটকা পড়ে যায়। খনিতে আগুন লেগে যায়। হৃদয়হীন মালিকপক্ষ খনিজ সম্পদ রক্ষা করবার জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলের বাঁধ ভেঙে দেয়। বিপদগ্রস্থ শ্রমিকদের উপরে তোলার কোনরকম চেষ্টাই করা হয় না। কারণ শর্তানুসারে কয়েকজন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিতে তাদের যা খরচ হবে তার চেয়ে অনেকগুণ অর্থের কয়লা আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ওপর তাই খনির মালকাটা জুলুর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর—“এই তো শালাদের বদমাইসি। টাকার লোভ দেখিয়ে ফাঁসির কাঠে পাঠিয়েছে ছেলেদের।”^{৭০}

বিনু, সনাতন, কুদরৎ, মোস্তাকদের সঙ্গে সুবেদার মহাবীর সিংও খনি গর্ভে প্রবেশ করে। খাদে কোন গ্যাস নেই বলে মহাবীর যে জোড়গলায় আশ্ফালন করেছিল মাটির ওপরে, তার সেই আশ্ফালন বুদ্ধবুদ্ধের মতো উবে গেছে খনি গর্ভে আটকা পড়ে। মাটি কাটার সময় যখন মহাবীর বলে যে, সে আর পারবে না তখন আরিফ প্রতিশোধ নিতে ভুলে না। আরিফ রেগে গিয়ে মহাবীরকে বলে—“চোপ শালা। কোম্পানীর দালাল, তুমিই তো ঢুকিয়েছো আমাদের এর মধ্যে, তুমি পারবে না মানে? ওঠ, (লাথি মারে) ওঠ শালা।”^{৭১}

সুড়ঙ্গ যখন বেশি পরিমাণে জল প্রবেশ করতে থাকে, যখন বুঝতে পারে সবাই যে আর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা নেই তখন সকলে কাগজ নিয়ে তাদের নিজের কথা লিখে একটা বাস্ক বন্দী করে ফাটলের মধ্যে সযত্নে রাখে।

বিনু তার ভাবনার কথা লেখে—

“এখানে কয়লার গায়ে লেপ্টে থাকবে আমাদের পুরো চেহারাটা ফসিল হয়ে। বহু শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে দেখবে সে ছাঁচ—কুড়িয়ে পাবে আমাদের হাড়—বলবে গবেষণা করে—পুরাকালে একদল অতিশয় বুদ্ধি সম্পন্ন মর্কট অথবা অর্ধমানব ভূগর্ভে বাস করত। আলো, বাতাস প্রভৃতি তারা সহ্য করতে পারতনা বলে মাটির সহস্রফুট তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে থাকত।”^{৬২}

এখানে ‘মর্কট’ অথবা ‘অর্ধমানব’ কথা দুটির মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হয়েছে অর্থলোভী খনি মালিকদের প্রতি।

সনাতন লিখেছে—

“পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমাদের ভুলোনা। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই- ঐশ্বর্য লিপ্সাই মানুষকে করে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসি মুখে আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে। আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে হুঁদুরের মতন না মরে।
—ইতি সনাতন মণ্ডল।”^{৬৩}

এরপর বিনু ও তার সহকর্মী শ্রমিকদের সলিল সমাধি ঘটে খনিগর্ভে। “তাদের প্রাণ বাঁচানোর আকুতি মালিক পক্ষের হৃদয়ানুভূতিকে স্পর্শ করতে পারে না। পুঁজিপতিদের ধন লাভের উন্মত্ত নেশার কাছে দরিদ্র সর্বহারা মানুষদের জীবন যে কত তুচ্ছ, কত সস্তা নাট্যকার তারই জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন ‘অঙ্গার’—এ।”^{৬৪} গল্পে বিনুর সঙ্গে রূপার একটা সম্পর্কের কথা প্রথমেই উঠেছিল। বিনু মাকে বলেছিল শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একতলা বাড়ি গড়ে দেবে। কিন্তু সে স্বপ্ন চিরকালের মতো শেষ হয়ে যায়। বিনু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মায়ের সেই আকাঙ্ক্ষার কথা শোনে (দিবি রে...)। রূপা অনেক যত্নে এই কয়লাখনির দেশে গোলাপ ফোঁটায়। কিন্তু তার সেই গোলাপ ফোঁটানোর প্রতীকে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়। এ নাটকের শেষ দৃশ্যে খনির মধ্যে ন’জন শ্রমিক জলের স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের শেষ ইচ্ছের কথা লিখে যায়। পরিণতিতে এই ন’জন শ্রমিকের সলিল সমাধি মালিক শ্রেণীর লোভ এবং সামান্য অর্থমূল্যে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিবিনি খেলার দৃশ্য এঁকে নাট্যকার দেখিয়েছেন শোষণ পীড়নের হাত থেকে মানুষের পরিব্রাণের যেন কোনো পথ নেই। কিংবা যা এ নাটকে স্পষ্ট করে বলা হয়নি—পরিব্রাণের একটাই পথ তা হল সমবেত প্রতিবাদের পথ। এ নাটকের প্রথমেই একটি সুন্দর সংসার চিত্র আঁকা হয়েছিল, বিনু, বিনুর মা, বিনুর বোন এবং দীননাথের গল্প দিয়ে। কিন্তু দীননাথ প্রথমেই খনিতে

মারা পড়ে। তার দেহ বহু দূরে ফেলে রেখে আসা হয়—এটা প্রমান করবার জন্যে যে দীননাথ খনির ভিতরে মরেনি। সনাতন খনির মধ্যে আটকে পড়েছিল। বেরিয়ে আসার পর কোম্পানি তাকে স্বীকার করেনি। খনিতে দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানি সব শ্রমিকের নাম খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। বিচারের নামে একটা প্রহসন হয় যেখানে বিচারক নিজে কোম্পানীর পক্ষে যুক্তি খোঁজে। পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে দৃশ্যটি বেশ উপযোগী। কোম্পানীর ম্যানেজার বিচারককে বলেছে— 'Lunch at the Director's Bungalow'. কথাটা বেশ তাৎপর্য বোধক। মোট কথা প্রথম থেকেই খনির শ্রমিকদের বাড়ির বর্ণনা, হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার ছবি, খনির ভিতরের অব্যবস্থা, শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা সবই শ্রমিকজীবনের নিষ্ফলতার দিকটাকেই তুলে আনে। এর মধ্যে একসময় খনিতে আটকে পড়া-সনাতনের অন্ধকারকে ভয় পাওয়া এবং প্রায় ধুয়ার মতো উক্তি 'আগুনটা উস্কে দাও' নাটকের একটা লক্ষ্য পূরণ করে। নাট্যকার প্রতিবাদের আগুনটাকেই উস্কে দেবার কথা বলেন—এবং এই ভাবে অঙ্গার থেকেই তাঁর নাটকে প্রতিবাদী চেতনা মুখ্য হয়ে ওঠে। উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকের পরিণতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি লিখেছেন এরকম পরিণতি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার অপরিণত অবস্থারই পরিচায়ক। “অঙ্গার’ নাটককে আমার অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। যে নামক ডুবন্ত মজুরদের আর্তনাদে শেষ হয় তার রচনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারলে আজ বড় আনন্দিত হতাম। বৈপ্লবিক নাটক লেখার বহু পায়তাদা করে যে ব্যক্তি ‘অঙ্গার’ লিখতে পারে তার রাজনৈতিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ।”^{৬৬} নিজের নাটক সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে বৈপ্লবিক নাটক সম্বন্ধে উৎপলের assessment এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট সৎ এবং নিরপেক্ষ। ‘অঙ্গার’ নাটক সে সময় আক্রান্ত হয়েছিল। ‘বড় লোকদের পত্রপত্রিকা’-এর সমালোচনা করল। কোনো কংগ্রেস নেতার নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে অভিযান হল। এ ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় অঙ্গারের শক্তি কত তীব্র ছিল।

অর্থলোভী মালিক শ্রেণীর এরকম নির্মমতার বিরুদ্ধে দর্শক ও পাঠক মনে ঘৃণা-ক্ষোভের সঞ্চারণ ঘটিয়ে নাট্যকার এই নির্মম-হৃদয়হীন ব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন ‘অঙ্গার’ নাটকটির মাধ্যমে। উৎপল দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন—‘The play ended in mere protest and appeal for better condition.’^{৬৭} পরে একটি লেখায় নাট্যকার আক্ষেপ করেছেন যে, এভাবে তাঁর নাটক শেষ করা ঠিক হয়নি।

ফেরারী ফৌজ : ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে ভিত্তি করেই উৎপল দত্ত ১৯৬১ সালে এ নাটকটি রচনা করেন। প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভায় ২৮.৫.১৯৬১ তারিখে। এই নাটক যাত্রাপালা হিসেবেও

অভিনীত হয়েছে। এছাড়া একাধিক হিন্দি অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়েছে।

উৎপল দত্ত নাটকটির শুরুতেই ‘নাট্যকারের কথা’ অংশে বলেছেন—

“ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও বটে। কোন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার তিরিশ দশকের প্রথমভাগে পূর্ববাংলার জেগে ওঠা যুবকদের বজ্র কঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।”^{৬৭}

নাটকটির অভিনয় দেখে মন্থথ রায় মন্তব্য করেছিলেন—“দেখলাম, নাটক নয়, মহানাটক। বাংলার অগ্নিযুগটি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেমন রচনা তেমনি অভিনয়। বাঙালির রাত্রির তপস্যাকে এমন ক’রে কেউ কখনো এমন রক্তোৎপল অর্ঘ্য দেয়নি এর আগে।”^{৬৮}

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। তার পরবর্তী সময়ের সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপকে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। একদল অদম্য তেজোদীপ্ত তরুণ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মরণপণ ব্রত গ্রহণ করেছিল। বিশ্বাসঘাতকের মায়া জালেও কেউ কেউ পা দিয়েছিল। বিদেশী শাসনের অন্যায়া-অত্যাচার, শাসন-শোষণের অবসানের জন্যে একদিন বাংলার যে তরুণ সমাজ জেগে উঠেছিল নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করেছিল নাট্যকার তারুণ্যের সেই নির্ভীক শক্তিকেই এ নাটকে দেখাতে চেয়েছেন। বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের যে অগ্নিযুগ তাকে এই নাটকে জীবন্ত করে এঁকেছেন। ত্রিশের দশকের গোড়ায় পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে বাংলার তরুণ সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের অভ্যুত্থান পর্বকে আশ্রয় করে ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের কাল্পনিক কাহিনীকে গড়ে তুলেছেন নাট্যকার।

“দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কঠিন ব্রত নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আত্মত্যাগের, নির্ভীকতার এক বিপ্লবী আদর্শ ফুটে উঠেছে এ নাট্যে। বিপ্লবের জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ-লাঞ্ছনা, শাসক গোষ্ঠীর নির্যাতনের বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো সময় কাটাতে হয়, ‘ফেরারী ফৌজ’ তারই শিল্পিত আলেখ্য।”^{৬৯}

‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকটির কাহিনী বা চরিত্র তথাকথিত ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে গড়ে ওঠেনি। এতে ইতিহাসের কোনো কাহিনী বা চরিত্র নেই। কিন্তু যে বস্তুটি এতে নাট্যরূপ লাভ করেছে তাকে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। এই নাটকের পশ্চাৎপটে রয়েছে সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা। এটি তার পরবর্তী কোনো সময়ের অতীত কাহিনীর পুনর্গঠন।

নাটকের শুরুতে রয়েছে তারুণ্যের বিদ্রোহী উচ্চারণ। যাত্রাপালার বিবেকের কণ্ঠে তা

ধ্বনিত হয়েছে—

“কে মালিক কে সে রাজা
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার ভাঙরে তালা
যতসব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।”^{১০}

এ গানের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে অত্যাচারী শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ইন্সপেক্টর হিতেন দাসগুপ্ত হঠাৎ প্রবেশ করে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয় এবং পালার সবকটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে নেয়। ১৮৭৬ সালের নাট্যাভিনয় আইন বলে হিতেন এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে।

ক্রমশ দেখা যায়, ভুবনডাঙ্গায় পুলিশ খোঁজ করছে শান্তি রায় নামে একজন বিপ্লবীকে, যিনি ছিলেন সূর্য সেনের শিষ্য। এই ভুবনডাঙ্গাতেই সেদিন যোগেন মাস্টারের ছেলে বিপ্লবী অশোক গুলি করে পুলিশ সুপার উইলমট সাহেবকে হত্যা করে। পুলিশ অশোকের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন করে। উৎপল দত্ত ‘Theatre as weapon of Revolution’ প্রবন্ধে লিখেছেন, বিপ্লবী থিয়েটার মানুষের মনকে জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবে। অশোকের মতো একটি মেধাবী ছাত্র—একজন শিক্ষকের পুত্র যে কোনো দিন আগুন ঝারানো পিস্তল হাতে তুলে নেবে—এ কেউ ভাবেনি। অথচ তাই ঘটেছে। আর অশোকের বাবা মা স্ত্রী-সকলেই পুলিশের অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে পুত্রের আচরণ সমর্থন করেছে। এই ভাবে হাতে পিস্তল নিয়ে আঘাত করতে পারা একটা আদর্শ তৈরি করে। সূর্য সেনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—কিন্তু তিনি আজও বাঙালী সমাজে আদর্শ পুরুষ। উৎপল দত্ত লিখেছেন—“There is a pistol held firmly in the hand and a finger on the trigger. This is an image which can rouse the people to take up arms.”^{১১} এই রকম চরিত্রের Image-ই মানুষের মনকে তৈরি করে।

শান্তি রায়ের বিপ্লবী সমিতির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল রাধারাণী নামক একটি চরিত্র। ভুবনডাঙ্গার এক বস্তিতে তার বাস। রাধারাণী জগতের প্রাচীনতম ব্যবসায় লিপ্ত হলেও দেশমাতৃকার সেবা করবার সুযোগকে সে হাতছাড়া করেনি। শান্তিদাকে বিপ্লবীদের অনেকেই চেনে না, কিন্তু রাধা চেনে। শান্তিদার নির্দেশে বিপ্লবীরা রাধার ঘর থেকে উইলমট সাহেবের কবরস্থান পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটে। যেদিন গোপন খবর পেয়ে ইন্সপেক্টর হিতেন দাসগুপ্ত রাধার বাড়িতে আসে সেদিন রাধা কৌশলে হিতেনকে বিষ মিশ্রিত মদ খাইয়ে হত্যা করে। বিপ্লবীরা হিতেনের লাশকে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে যায়।

আবার জনসন সাহেবকে হত্যা করবার জন্য বিপ্লবীরা যেদিন ইসলামপুরের খালের পোলের

নিচে অপেক্ষা করছিল সেদিন ভুল করে ফাদার ফ্ল্যানাগানকে হত্যা করবার ফলে বিপ্লবী দেবব্রত বিকার গ্রস্থ হয়ে রাধার ঘরে পড়েছিল। সেদিন ইন্সপেক্টর প্রকাশ মুখুটি দেবব্রত ও তার সঙ্গে রাধাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ রাধা সেদিন কিন্তু নীলমনি ওরফে শান্তিদাকে প্রণাম করতে ভুলেনি। রাধার এ অবস্থা দেখে শান্তি দা কৃতজ্ঞতা বশত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বলেন—“হাত কড়া ছিল বলে প্রণামটাও করতে পারল না। এমন এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে শান্তি রায় যে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল একবার বানবান করে উঠবে। আরো কি জানিস? দেশমাতৃকা আমার কাছে নিছক একটা কল্পনা নয়। তার মুখ ঠিক—ঠিক ঐ রাধার মতন সে দেখতে।”^{৯২}

এই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবার জন্য শান্তি রায় স্টীমার কোম্পানির তেলের গুদামে যান। যথা সময়ে জনসন সাহেব যখন স্টীমারে করে ঢাকা যাবেন, অর্থাৎ যখন স্টীমারে উঠতে যাবেন তখন ঐ তেলের ট্যাঙ্কে ডায়নামাইট ফেটে জাহাজঘাটা ভব্বীভূত হয়ে যাবে সঙ্গে ছাই হয়ে যাবে জনসন সাহেব। এই প্ল্যান করেই শান্তি রায় নির্দিষ্ট দিনে রাত দুটায় যথাস্থানে পৌঁছে যান তার বিপ্লবীদের সঙ্গে করে।

কিন্তু কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত শান্তিরায়ের পরাজয় হল। অশোক ছুটে এসে শান্তিদাকে পালানোর রাস্তা দেখাতে চাইলেও অশোককে বিশ্বাসঘাতক ভেবে শান্তি রায় নিজ হাতে গুলি করে। কিন্তু মৃত্যুর আগে অশোক বলে যায় “ভুল ভুল করছ! আমি বিশ্বাসঘাতক নই! আমাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছে!”^{৯৩} উইলমট সাহেবকে হত্যার অপরাধে অশোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছিল কিন্তু তবু অশোক সমিতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তাকে চক্রান্তের স্বীকার হতে হয়েছিল।

পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মুমূর্ষু শান্তিদা শেষ পর্যন্ত কুমুদকে বলে যান—“অশোক বিশ্বাসঘাতক নয়, সবাইকে বলিস। কিন্তু তবে কে? কে বিকিয়ে দিল সমিতিকে, দেশকে, তার নেতাকে?”^{৯৪} এবিস্ময় আমৃত্যু জানতে পারল না শান্তিদা।

শান্তি রায়ের লাশকে ঘিরে প্রচুর লোক জড়ো হয়। কেউ কেউ বলে শহীদ হয়েছে শান্তি রায়। কিন্তু ছিদাম নামক এক চরিত্র হঠাৎ জনতার ভির থেকে বলে ওঠে—“কে শান্তি রায়? এ কক্ষনো না। আমি চিনি তারে। অন্য কারো মাইরা আইনা ফালাইয়া গেছে এইখানে।”^{৯৫}

অপর আর একজন বলে “শান্তি রায় হতেই পারে না।”^{৯৬} আরো একজন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে—“শান্তি রায় অমর। শান্তিরায়ের মৃত্যু নাই।”^{৯৭}

শান্তি রায়ের শহীদ হওয়ার ঘটনায় জনচৈতন্যে জাগরণ ঘটেছে। সাধারণ মানুষের শান্তি রায়কে কেন্দ্র করে যে লড়াই তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। এক শান্তিরায় মরলে জনতার চেতনায়

জন্ম নেবে লক্ষ লক্ষ শান্তি রায়।

অতীতকে দিয়ে বর্তমানের দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকার ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকটিতে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা নাট্যকারের কাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি, অর্থাৎ ভারতের শোষিত বঞ্চিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। সেকারণেই নাট্যকার মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন ইতিহাসের সংগ্রামী চেতনার আলোকে। আর এখানেই নাটকটির সার্থকতা।

“উৎপল দত্তের মূল প্রবণতা সামাজিক বিপ্লবের ও বিদ্রোহের দিকে। ‘ফেরারী ফৌজ’- এ তার এক ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য কঠিন ত্যাগ যারা করল, তাদের সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা মানুষের হীন স্বার্থপরতায়, সামাজিক অবিচার, বৈষম্য আর শোষণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য জনগণের অনুরূপ ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের সময় এসেছে। তাদের মনে বৈপ্লবিক শক্তি তেজ সাহস এবং অনমনীয় মনোবল সৃষ্টির জন্য বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের মাধ্যমে তার এক আদর্শ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।”^{৭৮}

নাটকের ভূমিকা অংশে মন্মথ রায় তাই নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন—

“এ যুগের বাঙালী পেয়েছে অগ্নিযুগের এক সার্থক আভাস, এক স্বার্থক আশ্বাস। ইতিহাসও যা হয়তো করতে পারবে না, নাটক তা পারবে। ‘ফেরারী ফৌজ’ বাংলার সেই অগ্নিযুগকে বাঁচিয়ে রাখবে, প্রেরণা জোগাবে ভবিষ্যৎ বিপ্লবে— যার পদধ্বনি কান পাতলে শোনা যাবে আজকের এই দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায়।”^{৭৯}

‘ফেরারী ফৌজ’ ১৯৬১ সালে লেখা। কিন্তু এই নাটকের বিষয়বস্তু ১৯৩০ এর দশকের। ১৯৬১ তে কেন ১৯৩০ কে ফিরিয়ে আনলেন উৎপল? একটা বিষয় লক্ষণীয়—নাটক সব সময় সমকালীন সত্যের রূপ ভাষ্য। অথচ ‘ফেরারী ফৌজে’র গল্প অন্তত ৩০ বছরের পুরানো। আসলে ১৯৬১ সালে যে যুবশক্তি নতুন করে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে নেমেছিল এখানে উৎপল যেন তারই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। ১৯৩০ সালে বাংলার যুবশক্তি জেগে উঠেছিল—তাদের যে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গিয়েছিল তারই মধ্যে আছে যৌবনের প্রকৃত পরিচয়। ১৯৬০ এর দশকে একদল তরুণ যুবা স্কুল-কলেজ ছেড়ে একটা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারুণ্যের যে বজ্রদীপ্তি, তাকে উৎপল স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখেছিলেন—আবার তারই দীপ্র শিখাকে দেখতে পাচ্ছেন এই আন্দোলনে। ১৯৬১ সালে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়নি। কিন্তু বাংলার তরুণ সমাজের মনে আন্দোলনের আলোক দীপ্তি জ্বালবার জন্য উৎপল এ নাটকে বিপ্লবী

অতীতকে স্মরণ করেছেন। ৩০-এর দশকে সম্ভ্রাসবাদী আন্দোলনে স্বাধীনতা আনবার যে ভূমিকা ছিল তাকে সম্মান জানিয়ে দেশ গড়ার যে অসমাপ্ত দায়িত্ব এখনো অনারক্ক তাকে আয়ত্ত করবার কথা যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এ নাটকে। এ নাটকের শেষে দেখতে পাই শাস্তি রায়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং তারই দলের এক সহযোগীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সে পরিকল্পনার কথা আগেই শত্রুপক্ষ জেনে গেছে। তার ফলে শাস্তি রায় এবং তার দলের লোকেরা আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। উৎপল দত্ত তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ইতিহাসের ভিতর থেকে বিপ্লবের ভিতকে খুঁজে বের করতে হবে এবং এই বিপ্লবের ধারণা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করতে হবে। এজন্য বিপ্লবী থিয়েটারের কাজ হল এমন চরিত্র তৈরি করা যারা হবেন “Repository of the hopes and aspirations of Indian masses, thier liberator and protector, the one who fearlessly leads them in battle and is the first to die.”^{৮০}

মানুষের অধিকারে : বর্ণবৈষম্য এবং জাতিবিদ্বেষ প্রতিবাদী চেতনার জন্ম দেয়। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার শোষণ বঞ্চনা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। শোষিত মানুষ তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করে একদিন সংঘ শক্তির বলে গর্জে ওঠে। নাট্যকার শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এ বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকে।

এ নাটকটি সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। ১৯৩১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যের কৃষগঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের লড়াই নিয়ে ‘স্কটসবরো’ মামলা হয়। সেই ঘটনাটিকে উৎপল দত্ত সমকালের দেশীয় বাস্তবতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপন করেছেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রসঙ্গটিই এ নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। “মানুষের প্রতি রাষ্ট্রশক্তির যে অবজ্ঞা, অবমাননা, বৈষম্য প্রদর্শিত হয়েছিল বা হয় মার্কিন পটভূমিকায়, তা সমকালের ভারতেও লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার এ নাটকের বিষয়বস্তুকে এদেশের পক্ষে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপন করেছেন।”^{৮১}

নাট্যঘটনায় দেখা যায় নারী ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হয় কৃষগঙ্গ হে-উড এবং তার সঙ্গীদের। নাট্যঘটনার শুরু ডেট্রয়েট শহরে আগস্ট ১৯৬৭-র এক রাতে। কিন্তু এ ঘটনা কেবল ভূমিকা আর উপসংহারে সীমাবদ্ধ।

নাটকের ঘটনার সূচনায় দেখতে পাই ডেট্রয়েট শহরে এক কৃষগঙ্গ কিশোরীকে ধর্ষণের অপরাধে গ্র্যাণ্ডভিল নামের এক শ্বেতাঙ্গ যুবক ধরা পড়েছে। তাকে কী শাস্তি দেওয়া হবে সেই নিয়ে কৃষগঙ্গ যুবকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সেই সূত্রে স্টিভ একটি পুরানো ঘটনার কথা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনে সবার সমানাধিকারের কথা থাকলেও সমানাধিকার যে নেই—

মার্থার কথায় কেবল “বন্দুক হাতে নিলে সমান—নইলে নয়”^{৮২} সেই কথা ধরেই স্টিভ পুরানো ঘটনার কথা বলে। এইখান থেকে মূল গল্প পিছিয়ে যায় ৩৪ বছর, ১৯৩১ সালের স্কটসবরো মামলার কথা চলে আসে। স্টিভ শ্বেতাঙ্গ এক ধর্মকের ধর্মণের কথাসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্কটসবরো মামলার কথা তুলে আনে।

১৯৩১ সালের ২৫ শে মার্চ এলাবামা রাজ্যের পেন্ট্রক স্টেশনের অলস মধ্যাহ্নে স্টেশন মাস্টার এডওয়ার্ড ক্রসবি যখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন তখন টেলিফোনে আগের একটি স্টেশন থেকে কৃষ্ণাঙ্গ কয়েকটি কিশোরের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ ছেলেদের মারামারির খবর আসে। এটাই মূল উত্তেজনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এডওয়ার্ড ক্রসবি নিগ্রো মারবার উত্তেজনায় চারদিক থেকে লোক জড় করে ফেলে। ঘটনাটা ক্রসবির মুখে এরকম:

“কি একটা ব্যাপারে মারামারি লেগেছিল আর কি। নিগাররা মারতে মারতে শাদা ছেলেদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। সেই ছেলেরাই ছুটে স্টিভেন্সন্ স্টেশনে গিয়ে খবর দেয়। ওখান থেকে আমায় জানিয়েছে। আসুক, লিঞ্চ করবো শালাদের।”^{৮৩}

ক্রসবির কথাতেই দেখা যায় ‘কি একটা ব্যাপারে মারামারি’র অপরাধে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরদের ‘লিঞ্চ’ করাটাই মূল উত্তেজনার বিষয়। এ ঘটনার পূর্বসূত্র হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গদের গুলি করে মারার একটি ঘটনার কথা এসেছে।

“সেই ২৯ সালে একদল নিগার ট্রেনের ড্রাইভার হয়েছিল বটে। তা গোটা দশেককে গুলি করে মারবার পর সব ল্যাজ গুটিয়ে ভাগলো।”^{৮৪}

ট্রেন আসবার আগেই স্টেশনে নিগ্রো কিশোরদের হত্যা করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বন্দুক হাতে শ্বেতাঙ্গ বিল্ আসে, তার পিছনে আরো কয়েকজন দড়ি পেট্রলের টিন নিয়ে উপস্থিত হয়। ব্যাপারটা নিয়ে ক্রসবি বলে “উত্তেজনা হচ্ছে”^{৮৫}; বিল্ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। সে আগেই একজন ভাগচাষীকে হত্যা করেছে। সে হেসে বলে “এই প্রথম তো তাই একটু (উত্তেজনা) হয়।”^{৮৬} সে ডেকাটুরে ভাগচাষীকে মারার সময় ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে গিয়েছিল। তারা খুব জোরে জোরে জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছিল। তাতেই নির্যাতিত মানুষটির চীৎকার চাপা পড়ে গিয়েছিল। এই প্রথম অংশেই ইস্কুল মাস্টার প্রেণ্ডিকের মুখে নিগ্রোবধের নিষ্ঠুরতার গল্প উঠে এসেছে। অর্থাৎ এই উপস্থাপনা অংশেই নাট্যকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের চিত্র কয়েকটি ঘটনার সূত্রে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রেণ্ডিক ইস্কুলের মাস্টার কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার উত্তেজনা কারো থেকে তার কম নয়। “ভগবান যীশুর নাম নিয়ে শান্ত ভাবে ব্যাপারটার ফয়সালা করুন।... মনে রাখবেন আমরা ঈশ্বরের সৈনিক।”^{৮৭} যখন স্টেশনে কয়েকটি কৃষ্ণাঙ্গ

কিশোর এসে নামল তেরো-চোদ্দ থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেরা—তারা সব ভয়াত চোখে তাকিয়ে আছে—তাদের ঘিরে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারী মুখ উল্লাসে উত্তেজনায় আরক্ত আর পুলিশের এক কনস্টেবল হিল তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করছে “দুটো ঘুসি মেরেছিস বলে তোদের ফাঁসিতে লটকাতে দেব না।”^{৮৮} হিল যখন এই নিগ্রো হত্যার আনন্দে উত্তেজিত লোকেদের তাড়িয়ে দেয় এবং ইস্কুল মাস্টারকে বলে—“তোকে যেতে হবে সবচেয়ে আগে!”^{৮৯} চেষ্টা করে ছেলেগুলোকে বাঁচাতে তখনই ঘটনার মধ্যে আসে নতুন প্রসঙ্গ। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে গ্রিন বিল, প্রেণ্ডিক, ক্রসবি এবং সঙ্গে শার্টপ্যান্ট পরা দুটি মেয়ে—ভিক্টোরিয়া প্রাইস এবং রুবিবেটস। প্রেণ্ডিক গুরুতর অভিযোগ আনতে চায়, হিল তাকে আবার তাড়িয়ে দেয়। “যতসব যৌনব্যধিগ্রস্ত বাজারের... এনে আমার স্বাস্থ্য খারাপ করবার কি অর্থ?”^{৯০} —হিল ঠিকই বোঝে এই মেয়েরা আসলে কী, তবু নাট্যকার শেষ পর্যন্ত দেখান হিল বিশ্বাস করে—শ্বেতাঙ্গরা মিথ্যে কথা বলতে পারে না। “হিল।। সাদা চামড়ার মেয়ে মিথ্যাবাদী এটা নিগারের মুখ থেকে শুনতে চাই না।”^{৯১} সে শেরিফ ওয়ারেন কে বলে “এই নিগাররা শাদা মেয়ে ধর্ষণ করেছে।”^{৯২} অর্থাৎ নাট্যকার দেখাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সম্বন্ধে ধারণাটা এতই নঞর্থক যে কেউ তার হাত থেকে বাইরে থাকতে পারছেন। শেরিফ ওয়ারেন একটু আলাদা। হিলকে ওয়ারেন বলেন: “দুটো বেশ্যার জবানবন্দী। আর তার জন্য আদালত আছে। তুমি বিচার করার কে?”^{৯৩} ঘটনাটাকে মার্কিন শ্বেতাঙ্গ জনগণের অভ্যস্ত আচরণের বাইরে নিয়ে গিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে স্থাপন করে নাট্যকার দেখালেন মার্কিন আইন সত্যিই সবার ক্ষেত্রে সমান কিনা। পরের দৃশ্য/অংক সেই আদালতের বিচারের দৃশ্য।

কনস্টেবল হিল যাকে বলেছিল ‘যৌনব্যধিগ্রস্ত বাজারের মাগী’ আর শেরিফ ওয়ারেন বলেছিলেন ‘দুটো বেশ্যার জবানবন্দী’ তারই ভিত্তিতে ডেকাটুর শহরের আদালতে হে উড প্যাটারসন এবং অন্যান্য কিশোর কৃষ্ণাঙ্গদের বিচারের প্রহসন দেখানো হয় বিচারের দৃশ্যে। মার্কিন আইন যে সমানাধিকারের আইন নয় শ্বেতাঙ্গদের বিচার ব্যবস্থা যে শ্বেতাঙ্গ পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন, বিচার দৃশ্যে নাট্যকার তাকেই তুলে ধরেছেন। এটি একটি মার্কিন মামলার অনুসরণে নির্মিত, কাজেই ঘটনার ভিত্তি নাট্যকারের মনগড়া নয়। বিচারক ক্যালাহান, সরকারী উকিল এটর্নি জেনারেল টম নাইট, অশিক্ষিত জুরি, বর্ণবিদ্বেষী একদল রক্তোন্মাদ দর্শক সবাই মিলে বিচার পদ্ধতিকে একটা মনগড়া পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। এটর্নি জেনারেল টম নাইটকে ইস্কুল মাস্টার প্রেণ্ডিক বলে—“আমরা মার্কিন নাগরিকরা আপনার মুখ চেয়ে আছি! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিগারদের রাজ্য নয় তা বুঝিয়ে দিতে হবে।”^{৯৪} তার উত্তরে টম নাইট বলেন—“আমার উপর আপনাদের আস্থা

আছে জেনে সুখী হলাম”^{৯৬} দর্শকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে টম নাইট জানান: “আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সংস্থা... সমস্ত পৃথিবীতে এলাবামার নামে অপবাদ রটনা করছে। এই স্কটস্বরো মামলা নিয়ে মস্কোয়, বার্লিনে, পিকিঙে লণ্ডনে, প্যারিসে মিছিল বেরিয়েছে। বড় বড় মনীষী ওদের প্রচারে ভুলে আমাদের আক্রমণ করেছেন।”^{৯৭}

এর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মার্কিনী গৌরবে তিনি যোগ করেন “আজ বোধ হয় জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারুর কাছ থেকে আইন শিখবে না!”^{৯৮} তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নাইটের ছবি ওঠে। রিপোর্টার জিগ্যেস করে কোন কোন মনীষী বিবৃতি দিয়েছেন? তার উত্তরে নাইট বলেন “ওসব অপমানকর বিবৃতি আমি পড়ি না।”^{৯৯} নাইটের সহকারী এইসব মনীষীদের নাম জানান আর শ্বেতাঙ্গ মার্কিন দর্শকেরা তাদের প্রতি অবমানাকর মন্তব্য করেন—

“বেইলি ॥ রোমাঁ রৌলা!

দর্শক -১ ॥ ব্যাং খেকো ফরাসী!

বেইলি ॥ মাদাম সুন-ইয়াং- সেন!

দর্শক -৬ ॥ চিংক্।

বেইলি ॥ টমাস মান্! আইনস্টাইন!

দর্শক -২ ॥ ইহুদি জারজ!

বেইলি ॥ থিয়োডোর ড্রাইজার।

নারী -১ ॥ ঘরের শত্রু বিভীষণ!

বেইলি ॥ এবং মাকসিম গোর্কী।

নাইট ॥ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শোষণভুক্ত ভদ্রলোক রুশ কমিউনিস্ট।”^{১০০}

বিচার দৃশ্যের শুরুতেই দেখি, শ্বেতাঙ্গ দর্শকে গোটা বিচারালয় ভরে গেছে। একজন দর্শক বলছে “বাইরে বিরাট পোষ্টার মেরে এলাম, এলাবামায় নিগারদের ঠাণ্ডা করো।”^{১০১} নারীরাও এই ধর্ষণের মামলা দেখতে এসেছে। বিখ্যাত আইনবিদ লিবোভিটসকে দর্শকরা নানাভাবে বিদ্রূপ করে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে সাধারণ ভদ্রতটুকুও নেই তা বেশ স্পষ্ট হয়। বিচার দৃশ্যের অভিনয় সবসময় বেশ আকর্ষক হয়। এখানেও হয়েছে। আইনের যে তর্কে উত্তেজনা থাকে তা দর্শকদের কৌতূহলী করে রাখে। পবিত্র সরকার লিখেছেন—“আদালতের সওয়াল জবাবের মধ্যে স্বভাবতই নাটকীয় সম্ভাবনা মারাত্মক রকমের বেশি, নাট্যকার তার একফোঁটা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দেন নি।”^{১০২} একথা সম্পূর্ণ সত্য। পবিত্র সরকার আরও গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এ নাটকে দু’জন উকিলের সওয়ালের রীতি দুরকম। সরকারি উকিলের সওয়াল চলেছে সরলরেখায়

কিন্তু আসামী পক্ষের উকিল লিবোভিটসের সওয়ালকে তিনি বলেছেন— ‘ত্রিভুজের মতো একটি চালু জায়গা থেকে ক্রমশ ক্লাইম্যাক্সে’^{১০২} পৌঁছানোর রীতি। এক একটি অভাবিত তথ্য দিয়ে তিনি সাক্ষীর মিথ্যেকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ঘটনাকে ঘৃণার সমতলে নামিয়ে আনেন। নাটকের বিচার দৃশ্যই এর প্রাণ; একটি ঘটনা ঘটিয়ে তার বিচারগত অসাম্য এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের মূল যে কতদূর প্রসারিত লেখক তা উদ্ঘাটন করেছেন। ক্যালাহান বা টম নাইটের আইনজ্ঞান কম, সমদর্শিতা একেবারেই নেই কিন্তু শ্বেতাঙ্গ গৌরববোধ আছে। তা দিয়েই তারা বিচার করছেন। দুটো বিচার দৃশ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় কীভাবে বিচারের নামে একটি কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে হত্যা করার পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নাটকটি এগিয়ে গেছে। এমনকি রুবিবেট্‌স যখন বিচারালয়ে সত্য কথা বলে তার পূর্ববর্তী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তখনো বিচারক কিংবা সরকারি আইনজীবী তাকে নাস্তানাবুদ করে। বিচারক হিসাবে ক্যালাহানও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অধিকার রক্ষার পক্ষে। হে উড প্যাটারসন দোষী সাব্যস্ত হয়। আমেরিকার সমানাধিকারের আইন একদল কালো মানুষকে হত্যা করার আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পেশকার যখন জুরিদের রায় পড়ে শোনান তখন আদালত উল্লাসে ফেটে পড়ে। লোকে টেবিলের উপর উঠে লাফায়। নাইট ও বেইলি উন্মাদের মত কর মর্দন করে আর একটি শিশু ঘরময় লাফিয়ে বেড়ায়—দোষী দোষী। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বড় থেকে ছোট পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ অধিকার বোধ কীভাবে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম এই অসাম্যের বীজ বয়ে বেড়াচ্ছে। এই অসাম্যের হাত থেকে মুক্তি কোনো বিচারালয় দিতে পারে না। এজন্যই একেবারে প্রারম্ভিক পর্বে স্টিভ বলেছিল—‘আমেরিকায় একমাত্র আইন—আগ্নেয়াস্ত্র।’

উকিল লিবোভিটস ভিক্টোরিয়া পিটার্সকে এগারো বার মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা সত্ত্বেও শেষে জুরিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারপতি ক্যালাহান হে-উড প্যাটার্সনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

এরকম প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে সরকারবিরোধী প্রতিবাদী যুবশক্তিকে হত্যা করার দৃষ্টান্ত শুধু ডেট্রয়েটেই রয়েছে তা নয়, ভারতের মাটিতেও এরকমটা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তাই এই ঘটনার বিরুদ্ধে মার্কসীয় দর্শনে উদ্দীপিত লিবোভিটসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যেন এদেশেরই কোন এক প্রতিবাদী সত্তার কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়। মনে হয় যেন নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ভারতের সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় একাকার হয়ে গেছে।

আমেরিকার কালো মানুষেরা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা প্রতিমুহূর্তে যেন শৃঙ্খলিত, পদদলিত। কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণেই তারা তাদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে নির্মম ভাবে বঞ্চিত। গোটা দেশজুড়ে শ্বেতাঙ্গরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, হত্যা, নির্যাতন এবং নারী ধর্ষণের

মাধ্যমে। অথচ দেশের আইনে আছে যে, সব আমেরিকানের অধিকার সমান। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আর সেই কারনেই স্টিভ, মার্থা এরা বিদ্রোহী হয়েছে। তাদের বিদ্রোহ নিজের অধিকারকে ফিরে পাবার বিদ্রোহ।

ঠিক একই কারণে বিদ্রোহী হে-উড। আদালতের রায় প্রহসনে পরিণত হলে হে-উড বিপক্ষের উকিল নাইটকে জানায় “ভুল করছেন। আগে মরবে আমার হত্যাকারীরা প্রত্যেকে, তারপর মরব আমি। যেদিন আমার সাক্ষীদের হাতে রাইফেল দেখা দেবে, সেদিন যে আমি আবার বেঁচে উঠবো।”^{১০০}

হে-উড-এর বিদ্রোহী সত্তা যেন কৃষ্ণগঙ্গদের সম্মিলিত শক্তির লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করে গেছে। সে সুরে সুর মিলিয়েছে স্টিভ—“হে কৃষ্ণবর্ণ চারণ কবি। নতুন গান গেয়ে শোনাও আমায়। সে গানে থাকে যেন মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ- সে গানে থাকে যেন দর্পিত খুনিদের প্রতি ...যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ। —আমাকে শোনাও মুক্তি ক্ষুধায় অধীর সেই সব কালোমানুষের গান যারা চায় মুক্তি যুদ্ধ!”^{১০৪}

নবজীবনের এই গান গাইতে গাইতে সমস্ত কৃষ্ণগঙ্গ শক্তি একত্রিত হয়। যুগ যুগ ধরে তারা নিপীড়িত কালোমানুষের দল শক্তি সঞ্চয় করে নীরবে। এরপর এক দিন প্রতিবাদের বজ্রাঘ্নিতে জ্বলে ওঠে। দর্পিত খুনিদের প্রতি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। শ্বেতাঙ্গদের ‘নিগার’ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের কালো মানুষ তথা মানবজাতির অবমাননা থেকে মুক্তির জন্য শপথ নেয় সম্মিলিত কৃষ্ণগঙ্গ শক্তি, সংগঠিত হয় দেশের সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। দিকে দিকে জাগরণ ঘটে প্রতিবাদী সত্তার।

‘অঙ্গার’ নাটকের শেষ দৃশ্যে সনাতনের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলিয়েছিলেন ‘পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমাদের ভুলোনা।’ সেখানে শ্রমিকদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য। যদিও উৎপল দত্ত এধরণের পরিণতি পরে পছন্দ করেননি। কিন্তু অঙ্গারের প্রতিবাদের এই ছিল ধরণ। তাকে উৎপল ‘mere protest’ বলেই থেমে গেছেন। রূপা-বিণুর প্রেমের স্বপ্ন সেখানে বিফল, বিনুর মার ঘরের স্বপ্ন সার্থক হল না— শ্রমিকদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সেখানে মালিকদের চাপে বিনষ্ট—বিচারকের পক্ষপাত দুষ্টতায় বিচার প্রহসনে পরিণত। মালিক পক্ষের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তির সামঞ্জস্যের ফলে শ্রমিকদের প্রতি কোনো সুবিচার হয় না। সেখানে মালিকপক্ষের লোক কয়লাখনি বাঁচানোর জন্য শ্রমিকের প্রাণ তুচ্ছ করে খনিতে জল ভরে দেয়। প্রতিবাদ সেখানে পরোক্ষ। শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ এবং মালিকদের উৎপীড়ন ও শোষণের প্রতি জনরোষ সৃষ্টিই সেখানে প্রতিবাদের লক্ষ্য। কিন্তু ‘মানুষের

অধিকারে’ নাটকে এই প্রতিবাদ অনেক বেশি দৃশ্য। সেখানেও তিনি কালো মানুষদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু ‘অঙ্গারে’র চেয়ে তার তেজ অনেক বেশি। এই নাটকটি সম্পর্কে সে সময় বেশ সোরগোল পড়েছিল। এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকটিকে ‘সবচেয়ে পরিণত’ এবং লিটল থিয়েটারের গ্রুপের “সবচেয়ে ভালো”^{১০৬} নাটক বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে পার্টি লাইনের সঙ্গে এর সঙ্গতি হচ্ছে না বলে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেছেন।^{১০৭} বিশেষত ‘দেশব্রতী’ পত্রিকার এই সমালোচনা এত তীব্র হয়েছিল যে উৎপল দত্ত এর জবাব লিখেছিলেন। কিন্তু ‘দেশব্রতী’ তা ছাপেনি। তাই আলাদা পুস্তিকা আকারে তিনি সে প্রতিবাদ ছেপেছিলেন।

‘দেশব্রতী’র সমালোচনার মূলকথা ছিল “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবৈষম্য ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ফল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষগঙ্গ জনগণ ও মার্কিন শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব শ্রেণীদ্বন্দ্ব।”^{১০৮} ‘দেশব্রতী’র সমালোচনায় বলা হয়েছিল “একটি বলাৎকারের জাল মামলাকে বেছে নিয়ে তার দীর্ঘ বিলম্বিত বিচার কাহিনীকে নাটকের মুখ্যবস্তু তথা একমাত্র বিষয়বস্তু করে তোলার মধ্যে যে বিকৃত বুর্জোয়া মানসিকতা ও নিকৃষ্ট বুর্জোয়া পাটোয়ারী বুদ্ধির পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন তা সত্যই লজ্জাজনক।”^{১০৯} উৎপল দত্তকে এ জন্য নয়া সংশোধনবাদী’ও বলা হয়েছিল। উৎপল লিখেছেন ‘মানুষের অধিকারে’ নাটক নিয়ে তীব্র ধিক্কার (Sustained abuse) উঠেছিল এবং তাঁকে CIA র দালাল বলা হয়েছিল। "This time we were called C.I.A. agents because we had glorified an uprising which was led by the Black power organisation and it was openly declared that anything which did not mention Mao-Tsetung by name was reactionary."^{১১০} উৎপল দত্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে লেখা লিখেছিলেন ‘দেশব্রতী’ তা ছাপেনি। তিনি এটিকে ‘Black Power’ নামক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছিলেন। উৎপলের সপক্ষে পবিত্র সরকার যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে নাটকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কম তাঁর নাট্যকৌশল ও নাট্যগুণ নিয়ে আলোচনাই মুখ্য। নাটকের শেষ অংশের একটি উক্তি— ‘ভুল করছেন। আগে মরবে আমার হত্যাকারীরা প্রত্যেকে, তার পরে মরবে আমি’— এটিকে তিনি অনেক বেশি তীব্র ও ভাবগর্ভ বলে মনে করেন।

‘দেশব্রতী’র সমালোচনার মূল কথা ছিল উৎপল কালো মানুষদের সঙ্গে সাদা মানুষদের বিরোধকে খাট করে দেখেছেন। যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের তাৎপর্য ছিল তাকে ফলাও করে বর্ণনা না করে কেবল একটি ধর্মণের মামলার মধ্যে নাটককে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ম্যাক্সিমগোর্স্কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষগঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বিরোধের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের চেহারা দেখেছিলেন। ১৯৩১ সালে স্কটস্‌বরো মামলা হয়; ১৯৬৭ সালে তারই প্রেক্ষাপটে উৎপল সাদা মানুষ ও কালো মানুষের

বিরোধকে ঘনীভূত করে ‘মানুষের অধিকারে’ নাটক লেখেন। তিনি একটি মাত্র বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে এই বিরোধকে ঘনীভূত করেছিলেন— এবং সেটাও মিথ্যা এবং শ্রেণীসংগ্রামের তাৎপর্যের তুলনায় তুচ্ছ। কিন্তু যে ঘটনার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের তাৎপর্য ছিল, বাস্তবে তা মার্কিন সমাজে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি। ১৯৩১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কৃষক মানুষের লড়াই কখনো কম কখনো বেশি কিন্তু মার্কিন সমাজে তা শ্রেণীসংগ্রামের আকারে ব্যক্ত হতে পারেনি। অন্যদিকে উৎপল দত্ত শ্বেতাঙ্গ মানুষের যেমন একটি কৃষকায় নারীধর্ষণের ঘটনাকে সামনে রেখে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ—বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের কৃষকায় মানুষের প্রতি ঘৃণা দেখিয়েছেন— গোটা শ্বেতাঙ্গ সমাজটার মধ্যে কৃষক মানুষের প্রতি বিরোধের ভয়াবহ রূপটি উদ্ঘাটন করেছেন তেমনি গোটা পৃথিবীর কৃষকায় বা অ-মার্কিন মানুষদের প্রতি মার্কিন নিপীড়নের ঘটনাকেও রূপায়িত করে দিয়েছেন। ‘মানুষের অধিকারে’ তাই একটি ধর্ষণের ঘটনাকেন্দ্রিক নাটক নয়—পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানুষের উপর নিপীড়ন তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাটক।

সমাজতান্ত্রিক চালঃ চীন ভারতের যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’ নাটকটিতে খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ ও উদাসীন সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিঃস্ব অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে এ যুদ্ধের কোন মূল্য নেই। তাই “১৯৬৪ সালের নভেম্বরে সি পি আই (এম) এর সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষে দেশের খাদ্যসংকটকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত লেখেন “সমাজ তান্ত্রিক চাল।”^{১০}

নাট্যঘটনায় দেখা যায় সর্বশান্ত যুবক হৃদয়রঞ্জন মাইতি কংগ্রেস এম. এল. এ. গৌরহরির কাছে কাজ চাইলে তাকে প্রথমে চীনের হিংস্রতা ঠেকানোর জন্য কমিউনিস্ট ঠ্যাঙানোর কাজ দেয়। বিনিময়ে হৃদয়ের চাই একমুঠো অন্ন সংস্থানের চাল।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে শহীদের ছেলে হৃদয় অন্নসংস্থানের আশায় ধুকছে আর মজুতদার নটবর সিং গুদামজাত করে রেখেছে আপামর জনতার মুখের ‘অন্ন-চাল’। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বিক্রি করেও শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই চালের যোগার করতে পারছে না, তখন হৃদয়, এম. এল. এ. গৌরহরিকে জানায়—“চাল, মাছ, তেল, নুন, যে আজ পাওয়া যাচ্ছে না এর জন্য কাকে ঠ্যাঙাতে হবে বলুন।”^{১১}

জনগণ গণেশের নেতৃত্বে কালোবাজারী মজুতদারদের সঞ্চিত ধন উদ্ধার করার জন্য সংগঠিত হয়ে আসে, সোচ্চার হয়ে ওঠে সমবেত ক্ষুধার্ত মানুষ। এম.এল.এ. গৌরহরি সমাজতন্ত্রের নামে ভাওতা বুলি আওড়ায়। দেশে খাদ্যাভাবের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দোষারোপ করে। তখন গণেশ জানায়—

“মহলানবীশ কমিশন বলেছেন—ভারতের বর্তমান খাদ্যসম্ভার এ জনসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যার জন্যেও যথেষ্ট। ভারতের সমস্যা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বন্টনের বৈষম্য। বর্তমানে খাদ্যাভাবের জন্য দায়ী আপনার প্রভুরা, মজুতদারের দল। ওদের পায়ে দেশকে সাঁপে, ওদেরই মুনাফার বলি জনসাধারণকে শূয়োরের পাল বিশেষণে অভিষিক্ত করছেন। আপনাদের এই বদমাইশির কোন ক্ষমা নেই। ...জবাব একদিন আপনারা পাবেন। এর জবাব দেব; আমাদের শিশুদের জন্যেই এই সমাজ। আপনাদের প্রভু ঐ পেটমোটা যৌনব্যাপিগ্রস্থ মুনাফাবাজদের নয়!”^{১১২}

হৃদয় চাল চাইলে নটবর অস্বীকার করে। বরং রেশন কার্ড না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়কে বায়ু সেবন করে থাকতে বলে। আবার মালতী নামক এক মহিলা তার দেড় বছরের এক শিশুকে জলে ফেলে দেয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং পাগলী সব্যস্ত করে। কিন্তু গনেশ জানায় মালতীর শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী নটবর ও তাদের রক্ষাকারী এম. এল. এ. -রা। তাই এদের শাস্তি পাওয়া উচিত। এর জন্য গনেশকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলে এম এল.এ. -র বিরুদ্ধে হৃদয়ের স্পষ্ট বার্তা নিষ্কিপ্ত হয় যে, ঐ মহিলা তার বোন। আর ঐ বাচ্চার জন্যেই সে চাল চাইতে এসেছিল।

নাটকটিতে দুটি বিষয় দেখা যায় প্রথমতঃ সরকার পক্ষ সমাজতন্ত্রের নাম করে জনতাকে ভাঁওতা দিয়ে মজুতদারদের স্বার্থকে রক্ষা করেছে।

দ্বিতীয়তঃ কালোবাজারি মজুতদাররা প্রশাসনকে যাদু দণ্ডের সাহায্যে বশ করে অর্থাৎ প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। আর সাধারণ মানুষের দিন ক্রমশ সংকটময় হয়ে উঠছে।

কমিউনিস্ট নেতা গণেশ ও তার সঙ্গীদের প্রতিরোধ প্রতিবাদ এই দু'জায়গাতেই। তাই সে মালতীর মামলাকে জনতার কাছে তুলে ধরতে চায়, যেন সারা দেশ এ ঘটনা শুনে শিহরিত হয়। কিন্তু এম.এল.এ গৌরহরি মালতীকে পাগলী বলেই দায়ীত্ব এড়াতে চায়। তাই গনেশের প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

“সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেব এই অভিযোগ, এই ফরিয়াদ। যেমন মহারাষ্ট্রে, যেমন মনিপুরে, বিহারে, তেমনি বাংলা দেশেও এই হত্যালীলার প্রতিরোধে মানুষ গর্জন করে উঠবে। মালতী নামে বাংলা দেশের এক লাঞ্ছিতা অপমানিতা মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আসুন দূর করি এই জঞ্জাল। এই দেশকে মালতীর সন্তানের বাসযোগ্য করে রেখে যাবো এই প্রতিজ্ঞা করি।”^{১১৩}

কল্লোল : যুদ্ধ জাহাজ খাইবার ও ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হয় উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকটি। মার্কসীয় দর্শনে আস্থাশীল হয়ে উৎপল দত্ত বাংলা থিয়েটারে প্রতিবাদী চেতনার ইতিহাসকে নির্ভীক উচ্চারণে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। তাই রাজনৈতিক থিয়েটারে তথ্যের খুঁটিনাটি বিচারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব দর্শনের আলোকে অতীতের ইতিহাসকে আয়নার মতো তুলে ধরেছেন। এরকম এক ইতিহাসের দলিল 'কল্লোল' নাটক।

'Theatre as a weapon of Revolution' প্রবন্ধে উৎপল দত্ত লিখেছেন "a revolutionary play is a burst of machine-gun fire in another form."^{১৪} এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন "It should prepare the mind of the people for protracted and bloody people's war."^{১৫} এবং এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, একজন যোদ্ধার দৃঢ় ভাবে পিস্তল ধরে থাকার ছবি— অনেক বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি বীরত্বব্যঞ্জক। "The revolutionary theatre must take a step forward and look into future when it will be ripe."^{১৬} এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎপল দত্ত তাঁর বিপ্লবী চেতনার নাটকগুলি লেখেন। তিনি আরও লিখেছেন—

"The task of finding roots in history, making revolution strike roots in the tradition of people, becomes doubly important when we analyse our past activities, especially those of the party, and have to confess that we have consistently failed to bring the concept of revolution close to the people."^{১৭}

উৎপল দত্ত বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসের বিপ্লবাত্মক ঘটনাকে অবলম্বন করে তাঁর নাটক রচনা করেছেন। এসব ঘটনার কাহিনিবিন্যাসে যেটুকু মৌলিকতা দরকার তা আছে কিন্তু কাহিনির কাঠামো মূল ঘটনার সত্যকে অস্বীকার করেনি। বিশেষ করে তাঁর 'কল্লোল' নাটক সম্বন্ধে একথা দাবি করা যায়।

'কল্লোল' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ নিয়ে এখনই তথ্যের অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। উৎপল দত্ত : নাটকসমগ্র (মিত্র ঘোষ) এর দ্বিতীয় খণ্ডে 'কল্লোল' নাটকের প্রথম অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ মিনার্ভায়। আবার ঐ গ্রন্থের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে দেবেশ চক্রবর্তী লিখেছেন প্রথম অভিনয় হয় ২৯ মার্চ ১৯৬৫। শুধু তাই নয় 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত

জীবনপঞ্জি’ প্রবন্ধে নৃপেন্দ্র সাহা লিখেছেন কল্লোলের প্রথম অভিনয় ১৯৬৫ খ্রি. ২৯ মার্চ আবার সৌম্যেন চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকে উৎপলের নাট্য অভিনয়ের যে বিবরণী দিয়েছেন তাতে লেখা হয়েছে ২৮ মার্চ ১৯৬৫ কল্লোল মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই প্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের লেখা ‘লিটল থিয়েটার ও আমি’ প্রবন্ধ থেকে পাচ্ছি “কল্লোল নামে ২৯ শে মার্চ ১৯৬৫। সিটা ছিল আমার জন্মদিন, আমার বয়স হল ছত্রিশ।”^{১৮}—মনে হয় এই তারিখটিই ঠিক। অন্যত্র কোনো ভাবে তারিখ দেবার ভুল হয়েছে। উৎপল দত্ত আরো লিখেছেন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর তিনি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু তখন সি.পি.এম দলের সদস্যরাই ‘কল্লোল’ নাটক অভিনয়কে চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

‘কল্লোল’ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শিকড়ের কথা। আগেই উৎপল দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি যেখানে তিনি বিপ্লবের সূত্র আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে, জনচেতনার ইতিহাসের মধ্যে অনুসন্ধান করার কথা বলেছেন। ‘কল্লোলে’র কাহিনী নৌবিদ্রোহের ইতিহাস থেকে নেওয়া। এ বিষয়ে ইতিহাস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ’ গ্রন্থে সরল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—“ভারতে নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীতে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা ও কার্যক্রম শুরু হয়।”^{১৯} নৌবাহিনীতে যে বিদ্রোহের কথা নিয়ে ‘কল্লোল’ নাটক লেখা হয়— সেটি ঘটে ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এর আগেও অনেকবার ছোটখাট বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। একটি হিসেবে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত নৌবাহিনীতে ১৯ বার বিদ্রোহ হয়েছে। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য নিজে নৌবাহিনীতে অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ‘নৌবিদ্রোহের ইতিহাস’ নামক বইতে ১৯৪৪ সাল ও ১৯৪৬ সালের বিদ্রোহের কথা লিখে গেছেন। নৌবিদ্রোহের একটা কারণ শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সেনাদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ। এ কথা সকলেই বলেছেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা ভাল খাবার ও পোষাক পেত, ভারতীয়রা পেত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং ছেঁড়া পোষাক। ১৯৪৪ সালে নৌসেনাদের মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত ঘটেছিল এরকম একটি ঘটনা থেকে। ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৪৪ সালের “ফেব্রুয়ারি নৌসেনাদের খাদ্যবর্জন দিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নৌসেনাদের মধ্যে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে একদল ভারতীয় নৌসেনাকে আফ্রিকা সীমান্তে পাঠানো হবে এবং কর্তৃপক্ষ এই সব সন্দেহজনক লোককে মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে।”^{২০} এই বিক্ষুব্ধ নৌসেনাদের প্রতি এরকম একটা অপরাধ মূলক কাজ সংঘটিত হবে এই সংশয়ে এবং আরো অনেক অন্যান্য কারণে ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে “নো ফুড নো ওয়ার্ক”^{২১} স্লোগান দিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। নৌবিদ্রোহের এই পর্বে বহু ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়, অনেকে শাস্তি পায়। দু’জন মহিলা সৈন্যকে গুলি করে মারা হয়। লেখক

দীর্ঘদিন কারাবাস ভোগ করেন। যে ভারতীয় জাতীয় নেতাদের উপর তাঁরা সাহায্যের জন্য নির্ভর করেছিলেন তাঁরা কিন্তু এই আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। নৌসেনারা এ যুদ্ধকে উপযুক্ত খাদ্য পোষাক এবং ইংরেজ সৈন্যদের সমান ব্যবহার পাবার আন্দোলন বলে শুরু করলেও তাঁদের মনে এ ধারণা ছিল যে “এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ এ যুদ্ধ তাদের মুক্তির যুদ্ধ।”^{১৯} এ আন্দোলনে ৫৫০০ ভারতীয় নৌসেনা গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৪৪ এর আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ভারতীয় সৈন্যদেরও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আবার নৌবাহিনীতে আন্দোলন শুরু হয়। ‘না খাবার না কাজ’ স্লোগান দিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য লিখেছেন “১৯৪৪ এর তুলনায় ১৯৪৬ সাল অনেক বেশি উপযুক্ত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্রোহের অনুকূলে।”^{২০} তলোয়ার জাহাজে ধর্মঘট কমিটির সভা হয়। এই জাহাজ হয়ে ওঠে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি।^{২১} এই আন্দোলনে খাইবার জাহাজ যোগ দেয়। খাইবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান টর্পেডোর আঘাতে জখম হয়ে ‘খাইবার’ ভাসতে ভাসতে গিয়েছিল ফ্রান্সের উপকূলে। সেখান থেকে জার্মান নাৎসিরা ঐ জাহাজ শুদ্ধ সবাইকে বন্দি করে রাখে। যুদ্ধের শেষে ছাড়া পেয়ে এবার তারা ফিরে এসেছে।^{২২} খাইবার ছাড়াও আরও অনেক জাহাজ এ আন্দোলনে যোগ দেয়। ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মোট ৭৪টি জাহাজ ধর্মঘটী নেতারা এবারেও সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই তাঁরা এরপর সব নির্দেশ নেবেন। এই আন্দোলন কিন্তু আগেকার আন্দোলনের চরিত্র থেকে একটু ভিন্ন ছিল। আগের আন্দোলনকে কংগ্রেস নেতারা সমর্থন করেননি। ধর্মঘটকমিটি যে দাবিগুলো সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করেছিল উৎপল দত্ত অবিকল সেই দাবিগুলি তাঁর নাটকে তুলে দিয়েছেন। তখন দিল্লিতে আজাদ-হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচার চলছিল। তাই ধর্মঘটীরা প্রথম দাবি তুলেছিল— সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকের মুক্তি চাই। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে ব্রিটিশ নাবিকদের সমান ভাতা খাদ্য পোষাকের কথা বলা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ ব্যবহার করা চলবে না। এই বিদ্রোহে ‘খাইবার’ জাহাজ বীরত্ব দেখিয়েছিল। ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি ছিল নৌসেনাদের আত্মীয়-স্বজনের বসবাসের ঘাঁটি। ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতেগুলি চলেছিল। ২১/২২ ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহের সমর্থনে ধর্মঘট হয়েছিল। ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি শুধু নয় সাধারণ জনগণও নৌসেনাদের জন্য খাবার হাতে সমুদ্র তীরে ছুটে এসেছিল। “খাবারের প্যাকেট কারো হাতে কারো হাতে খাবারের জল ভরা পাত্র। রেস্টুরেন্টের মালিকরা অনুরোধ জানাল জনগণকে, যতখুশি খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ রেটিংদের দিয়ে আসতে।”^{২৩} জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এই আন্দোলনকে প্রথমে গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে শেষ

পর্যন্ত তারা কৌশলী সমর্থন জানালেন। বোম্বাইয়ের এক কংগ্রেস নেতা জানালেন যে—‘জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ সক্রিয় ও শর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে।’ — কিন্তু তিনি এই আন্দোলনের সহিংস চরিত্র দেখে শিউরে উঠলেন। খাইবার জাহাজ নৌসেনাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আক্রমণের প্রতিবাদে যে ভাবে গর্জে উঠেছিল তাকে অবিমূষ্যকারিতা বলে তুচ্ছ করলেন এবং জনগণকে সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে বললেন “বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাঁদে পা দেবেন না।”^{১২৭}

উৎপল দত্ত ‘কল্লোল’ নাটকে ইতিহাসের তথ্যকে ইতিহাসের চরিত্র সমেত উপস্থিত করেছেন। ১৯৪৬ এর বিদ্রোহই তাঁর লক্ষ্য। তিনি খাইবার জাহাজকে এ আন্দোলনের প্রধান চরিত্রে পরিণত করেছেন। খাইবার জাহাজের যে চরিত্রটিকে তিনি সাদুল সিং নামে অভিহিত করেছেন তার প্রকৃত নাম মদন সিং। তিনি জাতীয় নেতাদের দ্বিচারিতা দেখে বিস্মিত হয়ে খাইবার জাহাজ থেকে ইংরেজ বাহিনীর উপর গোলা বর্ষণ করেন। ইংরেজ নৌসেনারা তখন ধর্মঘটী জাহাজগুলিকে ঘিরে তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। যখন ধর্মঘটী সেনারা কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ শুনে আত্মসমর্পণ করবার কথা ভাবছে তখন ব্রিটিশ সৈন্যরা কামান ও মেশিন গান দিয়ে বিদ্রোহী সেনাদের উপর গোলাগুলি চালায়। এই পরিস্থিতিতে খাইবার জাহাজের মদনসিং “দূরপাল্লার বড় কামানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে ... ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন। আবার মাইক্রোফনে দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন রাখেন Oh my beloved Country men! See our national leaders. They are nothing but traitors of our mother land.”^{১২৮}

শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনও ব্যর্থ হয়। মদনসিংকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কংগ্রেস নেতারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়েছিলেন “আপনাদের ওপরে যাতে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় কংগ্রেস অবশ্যই তা দেখবে”^{১২৯} কিন্তু কার্যত বহু নৌসেনা শাস্তি পায়। বহু সৈন্যকে বন্দুকের গুলিতে মরতে হয়। অনেকে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করে। গান্ধীজী এ আন্দোলনকে স্বীকার করেননি, জহরলাল এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বল্লভভাই প্যাটেল সৈন্যদের এরকম ভ্রান্ত আচরণকে নিন্দা করেছিলেন।

নৌবিদ্রোহ নিশ্চয় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু তা গান্ধীজীর অহিংস নীতির বিরোধী এবং গান্ধীজী তাকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু বামপন্থীরা তাকে সহিংস পথেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উৎপলদত্ত সেই বামপন্থা সমর্থন করেন। নাটকের প্রথমেই সূত্রধারের মুখে বলিয়েছেন—

“দেশ স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে
শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে।

স্বাধীনতা যেন শিশুর হাতের মোয়া
হরির লুঠের বাতাসা, কুড়িয়ে নিলেই হোলো।
বিপ্লব কি শীতের সকালে গলির মোড়ে
নবাগত মিঠে রোদের ফালি,
যার খুশি পোয়ালেই হোলো?”^{১০০}

উৎপল সূত্রধারের মুখে একের পর এক ভারতীয় বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের কথা তুলেছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বাঁশের কেলায় তিতুমীর, দেশপ্রেমিক ক্ষুদিরাম, ভগৎসিং, সূর্যসেন, কাট্রাবোন্মান আর আসামের মণিরাম—সুভাষচন্দ্রের আই.এন.এ-এরা সকলেই ছিল ব্রিটিশকে সশস্ত্র আন্দোলনের পথে হঠানোর পক্ষে। নাট্যকার নৌবিদ্রোহীদের সংগ্রামকে এই দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এ নাটকের রচনা রীতির একটা বিশিষ্টতা আছে। এটা কথকতা রীতির উপস্থাপনা। সূত্রধার বিভিন্ন সময়ের কাহিনীকে গেঁথে নৌবাহিনীর বিদ্রোহের কথা বলছেন। তিনি বলছেন ১৯৪৬ সালের বোম্বায়ের নাবিকের বিদ্রোহের কথা, কিন্তু তার আগে বলেছেন ১৯৪৩ সালের ১৬ আগস্ট ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি কেটে ইতালির উপকূলের দিকে যাচ্ছিল যে খাইবার তার বীরত্বের কথা। কেননা, এই খাইবারই হয়ে উঠবে নৌবিদ্রোহের প্রধান নায়ক। প্রথমে খাইবার জাহাজের দৃশ্য এবং পরে খাইবার জাহাজের সৈন্যদের পরিজন নিয়ে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তির গল্প বলেছেন নাট্যকার। প্রথম দৃশ্যে খাইবার জাহাজের মতো একটা পুরানো বহর নিয়েও কীভাবে রেটিং শার্দুল সিংহের বীরত্বে শত্রু জাহাজ পিছু হটে তার কাহিনী বলে খাইবার কে 'Glorified' করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে খাইবার সমুদ্রে হারিয়ে যায়। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। ফ্রান্সের উপকূলে জার্মান বাহিনী তাকে ধরেছিল এবং আটকে রেখেছিল। ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তির আত্মীয়রা এর কোনো খবর জানতে পারেনি। দ্বিতীয় দৃশ্যে 'খাইবার' ফিরে আসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার বহুদিন পরে খাইবার ফিরে এসেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মোতিবিবির (গফুরের মা) মুখে শোনানো হয় 'খাইবার' এসে গেছে। 'নৌবিদ্রোহের ইতিহাস' থেকে জানতে পারি ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহের সময় খাইবার ফিরে এসেছে। সেই 'খাইবার' জাহাজও এবারে এই দিনে বোম্বাইতে এসে গেছে।^{১০১} শার্দুল সিং-এর মুখে শুনতে পাই “আমি জার্মান বন্দীশিবিরে। আমার হাত বাঁধা।”^{১০২} সূত্র ধারের মুখে নাট্যকার বলিয়েছেন—

“মাটির তলায় চাপা ধিকি ধিকি আগুন
বহু সহস্র ক্ষুদ্র ক্রোধ ক্রমশঃ এক হয়ে
এক বিশাল আকাশ ছোঁয়া বিস্ফোভ।...”^{১০৩}

নাট্যকার ইতিহাসের তথ্যকে প্রায় পুরোপুরি মেনে চলেছেন। আগেই বলেছি নৌবিদ্রোহের সৈনিকরা যে দাবিগুলি পেশ করেছিল সেগুলিই অবিকল নাটকের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বোম্বাইয়ে তলোয়ার জাহাজ ছিল নাবিকদের সংগ্রামের ঘাঁটি। সেখান থেকে সাংকেতিক বার্তায় প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকের কাছে জানানো হয়েছিল :

“যদি দেশকে ভালোবাসো যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করে তবে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌবহরের হরতালে সামিল হও।”^{১০৪}

নাট্যকার দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে সূত্রধারের মুখে এই একই কথা বলিয়েছেন—

“বোম্বাই-এ তলোয়ার কেন্দ্র হোলো
নাবিকদের সংগ্রামী কমিটির ঘাঁটি।
সেখান থেকে সাংকেতিক বেতার বার্তায়
ছুটলো নির্দেশ প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকের কাছে,
যদি দেশকে ভালোবাসো
যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো,
তবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
নৌবহরের হরতালে সামিল হও।”^{১০৫}

বিস্ময়কর ভাবে ইতিহাসের তথ্য প্রায় একই ভাষায় নাটকের দৃশ্যে অনুসৃত হয়েছে। ‘খাইবার’ জাহাজ তখন ছিল আরব সাগরের মাঝখানে—করাচী যাচ্ছিল। সেখান থেকে বিদ্রোহে সামিল হবার জন্য সে বোম্বাই ফিরে আসে।

নাটকের ৩য় দৃশ্যের কাল ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬; নৌবিদ্রোহের দিন। এই দৃশ্যে দেখা যায় নাবিকরা ধর্মঘটের সময় একে অপরকে জানিয়ে দিচ্ছে। খাইবার জাহাজই নাটকের মুখ্য চরিত্র। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যের প্রস্তাবনা অংশে বলেছেন—

“আমার গল্পের নায়ক একটি জাহাজ
সামরিক ভাষায় ক্রুজার। তার নাম ‘খাইবার’—”^{১০৬}

সেই খাইবার জাহাজে একটা নিষিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। পত্রিকার নাম ‘পীপলস এজ’। জাহাজের অফিসার আর্মস্ট্রং-এর দুর্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হয়ে নাবিকরা বচসায় জড়িয়ে পড়ে এবং গানার সাদুল সিং সাহেবের দিকে মেশিনগান তাক করে সাবধান করে। রেটিংরা আওয়াজ তোলে “সাম্রাজ্যশাহী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।”^{১০৭}

উৎপল দত্ত নৌবিদ্রোহের ইতিহাস অনুসরণ করে নাটকের কাহিনী গড়ে তুলেছেন। তবে

এর চরিত্রগুলি সব ইতিহাসের কিনা সে প্রমান নেই। সাকসেনাকে ১৯৪৪ সালের নৌবিদ্রোহের একজন প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৯৪৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীতে যে আন্দোলন হয় মগনলাল, সাকসেনা সেখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। যে নিষিদ্ধ পত্রিকা নিয়ে সাহেবদের ক্রোধের আগুন দেখা দেয়, তার পরিচয় ১৯৪৪ সালের বিদ্রোহে পাওয়া যায়। গোপন কাগজ পত্র সহ উইমেন্স রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির উর্মিলা বাঈ এবং অনুভা সেন গ্রেপ্তার হন। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য নৌবাহিনীর অফিসার ছিলেন। তিনি বন্দী হয়ে মূলতানে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন। তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ব্রিটিশরা তাঁকে মুক্তি দেয়। তবে মগনলাল সাকসেনার কোনো খবর তিনি জানতে পারেননি। দ্বিতীয়বারের বিদ্রোহে সাকসেনা ছিলেন কিনা তিনি কিছু বলেননি। যাইহোক কংগ্রেস এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। জহরলাল বলেছিলেন নৌবাহিনীর এ ধরনের ধর্মঘট করার অধিকার নেই।^{১৩৮} গান্ধীজী সেই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেন।^{১৩৯} তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, পুনা থেকে এক বিবৃতিতে বলেন “নাবিকরা তাঁদের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের দ্বারা ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন।^{১৪০} সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের উপদেশ দেন।^{১৪১} ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার আত্ম সমর্পণকারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কংগ্রেস প্রস্তাব দিয়েছিল আত্মসমর্পণ কারীদের শাস্তি মুকুবের ব্যবস্থা করবে।^{১৪২} কিন্তু তা হয়নি। স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি এম.এস. খানকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী আরব সাগরের জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের কথা অনুসারে মদন সিংকে গুলি করে মারা হয়, আর এম.এস. খানকে একমণ ওজনের দুটো পাথর দু’পায়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় আরব সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়।^{১৪৩} সরল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ৪৫০০ বন্দীকে মূলতান জেলে পাঠানো হয়েছিল।^{১৪৪}

ইতিহাসের এই বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে ‘কল্লোল’ নাটক লেখা হয়েছে। আগেই উৎপল দত্তের কথা উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে— এরকম বিদ্রোহাত্মক নাটক তিনি লিখেছিলেন মানুষের মনকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করবার ইচ্ছায়। ‘কল্লোল’ দূর অতীত কালের কোনো স্মৃতি নয় তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিংস একটি বিদ্রোহ। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন সিপাহি বিদ্রোহের পর এরকম সহিংস বিদ্রোহ আর হয়নি। Revolutionary Theatre-এর যে ভূমিকা তা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তুলে ধরতেই তিনি ‘ফেরারী ফৌজ’ ‘তিতুমীর’ ‘কল্লোল’ প্রভৃতি নাটক লিখেছিলেন।

নাটকটিতে দেখা যায় নাট্যঘটনার কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে তিনটি স্থানে, প্রথমত খাইবার জাহাজে, দ্বিতীয়ত ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতে এবং তৃতীয় হেডকোয়ার্টার্স অর্থাৎ রিয়ার এডমিরাল র্যাট্‌ট্রে সাহেবের বাংলোতে। ১৯৪৬ সাল ২০ ফেব্রুয়ারি হরতালের খবর পেয়ে খাইবার জাহাজ

বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে প্রবেশ করল। নৌবিদ্রোহের ঘাঁটি ‘তলোয়ার’ জাহাজ থেকে বিদ্রোহীদের সভাপতি সাকসেনা আসেন ‘খাইবারে’র সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সাকসেনা তাঁদের ৮ দফা দাবি নিয়ে হরতালের কথা জানান। আন্দোলন চলবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস পদ্ধতিতে। ‘তলোয়ার’ এর নির্দেশ ছাড়া খাইবার কোন আক্রমণ করতে পারবে না।

কিন্তু ক্যাসল ব্যারাকে প্রচুর হরতাল সমর্থক ফিরিস্তি সেনাদের হাতে আহত ও নিহত হয়ে চলেছে দেখার পর ‘খাইবার’ চুপচাপ থাকতে পারেনি। গানার সাদুল সিং-এর নির্দেশে ‘খাইবার’ থেকে কামান চালানো হয় এবং ক্যাসল ব্যারাক এলাকায় বহু নিরীহ ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারায়।

বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস সর্দার সভাপতি মগনলাল জজোরিয়া এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং বামদের ডাকা ধর্মঘটে জাহাজীদের সামিল হতে নিষেধ করেন।

ওয়াটারফ্রন্ট বস্তির মানুষেরা ছিল জাহাজীদের নিকট আত্মীয় তাই জাহাজীদের কার্যকলাপের সঙ্গে তারাও জড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই তারা গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। সমস্ত ওয়াটার ফ্রন্ট বাসী দেশের জন্য লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এ ঐক্যবদ্ধ জনতার নেত্রী গানার সাদুল সিং এর মা কৃষ্ণবাঈ। বস্তির সমবেত সংগ্রাম-ক্ষুদ্ধ মানুষের এবং জাহাজের বিদ্রোহী মানুষের আন্দোলন একত্রিত হয়েছে ব্রিটিশরাজের এদেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষদের বিরুদ্ধে। তবুও দুর্ভাগ্যবশত এ আন্দোলনের পরাজয় ঘটেছে। নাট্যকার এ পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছেন স্বার্থবাদী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে। কেননা তারা কখনই চায় না বামপন্থীদের পাল্লা ভারীহোক, কখনই চায়না যে বামেরা জনগণের কাছে গুরুত্ব পাক।

তাই র্যাটট্রের বাংলায় মগনলাল আলোচনা সূত্রে বলেন—“পুরো দেশের আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে কংগ্রেস আর লীগের হাতে। লাল ঝাঙাওয়ালাদের হাতে নয়।”^{১৪৫}

র্যাটট্রে -সাহেব উত্তেজিত হয়ে খাইবারকে আক্রমণ করার কথা বললে মগনলাল আরো ঠাণ্ডা মাথায় বলেন—

“কিন্তু গাধার মতন খাইবারকে আক্রমণ করতে গেলে ওরা-ওরা গুলি চালাবেই। আর গুলি চালালে ওরাই হয়ে উঠবে এই লড়াইয়ের নেতা। ইতিমধ্যে সারা বোম্বাই সাদুল সিং, ইয়াকুব আর রাজগুরুকে নেতা বলতে শুরু করেছে। এ চলবে না। এই বিদ্রোহের নেতা থাকবে কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি সাকসেনা।”^{১৪৬}

মগনের এই হীন প্রবৃত্তি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় বহন করে।

মগনলাল খাইবার জাহাজ ও ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিকে দমন করতে চায় কৌশলে শান্তিপূর্ণভাবে। সাকসেনা র্যাটট্রের বাংলায় অহিংস পদ্ধতিতে আলোচনায় বসেছেন আপোষ মিটিং করতে। কিন্তু এ আপোষে সায় নেই সাদুলের তাই সে এ সকল আত্মঘাতী নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—“তাহলে দেখছি ঐ আলোচনা ভেঙে দেওয়ার জন্যে আর একটা যুদ্ধ বাধানোর প্রয়োজন ... ওরা আমাদের বেচে দেবে ব্রিটিশদের কাছে।”^{১৪৭}

সাদুল আপোষ মীমাংসায় বিশ্বাসী নয়। অহিংস পথে আন্দোলন হয় না, এ কথার প্রমাণ সে দিয়েছিল। হঠাৎ করে মগনের বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে বোর্ন্ট টেনে নিতেই মগন যখন চমকে যায় তখন সাদুল বলে—“দেখলেন তো? যত খদ্দর পরন না কেন, রাইফেলকে আপনি ভয় করেন। লড়াই সবসময় হয় রাইফেল দিয়ে। সবসময়ে তাই হবে। শাদা মালিক, কালা মালিক সবাই ভয় করে এই একটি জিনিসকে- রাইফেল। অহিংস লড়াই কথাটা স্ববিরোধী। ওটা একটা ধাঙ্গা। তাই অস্ত্র ত্যাগ করবো না।”^{১৪৮}

এর পর মগন জানায় সাদুলের মা এবং গফুরের বাবাকে র্যাটট্রে সাহেব বন্দী করেছে হোস্টেজ হিসেবে। যদি সে অস্ত্র ত্যাগ না করে তাহলে পুলিশ তাদের দুজনকেই গুলি করে মারবে। তবুও সাদুল অনমনীয় থাকলে শেষে তাকে সেক্রেটারী পদ থেকে বরখাস্ত করে জাহাজীরা রাজগুরুকে সেক্রেটারী করে তার নেতৃত্বে র্যাটট্রের বাংলায় আলোচনার জন্য যায়। কিন্তু আলোচনার বদলে জাহাজীরা বন্দী হল। সাকসেনা প্রতিবাদ করলে তাকেও বন্দীকরা হয়।

বস্তিবাসীদের ঠিক একই রকমভাবে প্রতারণিত করা হয়। সাদুলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লক্ষ্মী গোপন অস্ত্রের সন্ধান জানিয়ে দেয়। কিন্তু শর্তানুযায়ী লক্ষ্মী মুলন্দ বন্দী শিবিরে এসে দেখে তাকে প্রতারণিত করা হয়েছে। জীবিত সাদুল নয় তার লাশ নিয়ে আসা হয় তার সামনে।

বিশ্বাসঘাতক নেতারা ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা লাভের আশায় ও বিদ্রোহ দমনের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ব্রিটিশদের সহযোগী হয়েছিল।

“নাট্যকার নৌবিদ্রোহের শ্রমিকদের বিদ্রোহকে তুলে এনেছেন শ্রেণীসংগ্রামের মূর্তপ্রতীক রূপে।”^{১৪৯} নাটকের শেষে সূত্রধার তাই জানায় যে একটা খাইবার, একজন সাদুল প্রতীক মাত্র, দিকে দিকে রয়েছে এমন খাইবার, এমন সাদুল। বড়লোকের বোম্বাই নয় প্রণাম করেন ছোটলোকের বোম্বাইকে, ওয়াটারফ্রন্টের সাদুলের, কৃষগবাস্টয়ের বোম্বাইকে। আর আশা জ্ঞাপন করেন—“হে পশ্চিম প্রান্তের উদ্যত মশাল আবার জ্বলে উঠবে কবে - নূতন বিদ্রোহের দীপ্তিতে।”^{১৫০}

নৌবিদ্রোহের সময় দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র ও জনতার মিছিল। এক দিকে নৌবিদ্রোহ অপর দিকে ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে

দিশেহারা শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে কংগ্রেসী নেতারা শাসনক্ষমতা লাভের জন্য আপোষ রফায় তৎপর হয়েছিল। “নাট্যকার ইতিহাসের চাপা সত্যকে মানুষের মনের আঙুনে তাতিয়ে বর্তমানের সত্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।”^{১৫১} তাই তিনি নাট্যকাহিনীর মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, বোম্বাইয়ের খাইবার জাহাজের শ্রমিকদের নেতৃত্বে কিভাবে নৌবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল এবং দক্ষিণপন্থী নেতাদের অহিংস রীতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই চালিয়েছিল। এ লড়াইয়ে সাদুল একা নয়, একা নয় খাইবার, প্রতিজাহাজেই ছিল সাদুলরা এবং প্রতিটি জাহাজই যেন খাইবার।

এই বিদ্রোহকে কংগ্রেস সমর্থন করেনি—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মগললালের অনুরূপ কোনো অন্তর্ঘাত কেউ ঘটিয়েছিল কিনা জানা যায় না। ইতিহাস থেকে দেখা যায় অরুণা আসফ আলি নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন। মহাত্মাগান্ধী এ আন্দোলন সম্বন্ধে যে রকম বিশ্লেষণ করেছিলেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। আবার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকাও আন্দোলনে সহায়তা করেনি। অথচ নৌবিদ্রোহীরা কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতৃত্ব চেয়ে বার্তা দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহাত্মাগান্ধী এই সহিংস আন্দোলন সমর্থন করতে পারেননি। মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট এম.এ. জিন্না সাহেব এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাননি। তিনি বলেছিলেন ‘যদি নাবিকেরা নিয়মতান্ত্রিক আইন সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন’ তবেই তিনি তাদের অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করবেন। তিনি ধর্মঘট তুলে নেবার আবেদন জানান এবং ‘বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে ধর্মঘট বন্ধ করতে অনুরোধ করেন।’^{১৫২} কংগ্রেস মুসলিম লীগ তখন সম্ভবত ক্ষমতা লাভের একটা আঁচ পেয়েছিল। ক্রিপস মিশনের আসার মধ্যে গান্ধীজী-জহরলাল-জিন্না সকলেই এই সুযোগ দেখতে পাচ্ছিলেন। কাজেই নৌবিদ্রোহকে সমর্থন করে তারা সহিংস আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে চাননি। তবে কম্যুনিষ্টরা এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। জনসাধারণ যথাসম্ভব এদের সাহায্য করেছিল। তবে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত অনেকবারই নৌবাহিনীতে ছোটখাট বিদ্রোহ হয়েছিল। এর পিছনে ছিল নৌবাহিনীতে বৈষম্যমূলক আচরণ। ভারতীয় নাবিকদের খাদ্য এবং বস্ত্র ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। মজুরিও সমান ছিল না। তাদের উপর ইংরেজ প্রভুদের কঠোর শাসন ছিল আরো পীড়াদায়ক। পুরানো জাহাজ অপ্রতুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের নৌযুদ্ধে অগ্রসর হতে হত। ব্রিটিশ জাহাজ থাকত তার পিছনে। এখানে যেমন খাইবার জাহাজের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলিকে কর্তৃপক্ষ দমন করেছে। দ্বিতীয় যে কারণটা এই বিদ্রোহের পিছনে কাজ করেছে তা কিন্তু পরিকল্পনা প্রসূত। একটি গোপন বিদ্রোহী সংস্থা নৌবাহিনী বা স্থল বাহিনীতে কিছু বিপ্লবী চেতনার মানুষকে চুকিয়ে

দিয়ে নৌবাহিনী বা স্থল বাহিনীতে সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত সংগোপনে বিপ্লবী চেতনার প্রসার ঘটানো এবং বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলেন। নৌবিদ্রোহের ইতিহাসের লেখক ফণিভূষণ ভট্টাচার্য নিজে ছিলেন এরকম একজন নাবিক। কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা ছিল অল্প—অথচ নানা জায়গায় তারা যে সব আন্দোলন সংঘটিত করতে চেয়েছিল তাতে দেশের কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ নেতাদের সমর্থন ছিল না। এর ফলে সে সব বিদ্রোহ আঁতুড়েই বিনষ্ট হয়েছে। এবং বহু মানুষ-এর জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। অরুণা আসফ আলি বলেছিলেন—“এই সংগ্রামী নাবিকেরা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এ সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পরিণত হয় যদি তা সময়োচিত না হয় এবং এর পরিণামে আত্মঘাতী হতে হয়।”^{১৫৩}

নাট্যকার কংগ্রেস নেতৃত্বকে দোষ দিয়েছেন—তিনি মগনলাল, সাকসেনা প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের আচরণকে নিন্দনীয় করে তুলেছেন। যেকোন বিদ্রোহ নিশ্চয় জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু যেখানে ১৯/২০ বার নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে যেখানে পূর্ব থেকেই কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের সহায়তার প্রতিশ্রুতি নেই সেখানে এতবড় একটা সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়ের আন্দোলন অসফল হতে বাধ্য। নৌবাহিনীর বীর নাবিকদের আন্দোলনের জন্য আমরা আজ গৌরব করতে পারি। কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করতে পারি। অশ্রুজল ফেলতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হবার আগে শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যে জরুরি সে শিক্ষাও এখান থেকে পেয়ে যাই।

অজেয় ভিয়েতনাম : বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক মানচিত্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৯ এ আবার মাওসেতুং এর নেতৃত্বে চীনে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। এ দুটি ঘটনা পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে অত্যন্ত ভীতিদায়ক হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগে একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় অনেক দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন শুরু হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম যার পূর্বনাম ইন্দোচীন ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফ্রান্সের উপনিবেশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। ইন্দোচীনে ফ্রান্স পিছু হটে যাবার পর আমেরিকা এই অঞ্চলের উপর হাত বাড়ায়। ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি। ১৯৫৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে আমেরিকা প্রত্যক্ষ ভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করে। কমিউনিষ্টদের প্রতিপত্তি ও বিস্তার রোধ করবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারও আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য

ভিয়েত কং নামে বাহিনী তৈরি হয়। একে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিষ্ট সরকার। চীন ও রাশিয়া এবং অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশগুলি এই ভিয়েত কং দের সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে আমেরিকার মাথাব্যথা ছিল—কমিউনিজম-এর বিস্তারকে প্রতিহত করা। আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলির ভয় ছিল—যদি একটি দেশে কমিউনিজম বিস্তার লাভ করে তাহলে তার পাশাপাশি দেশগুলিতেও তা ঘটবে। এটাকে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে ‘ডোমিনো’ তত্ত্ব বলা হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই তত্ত্ব প্রবল ছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামেও তার প্রসারিত হবার সম্ভাবনা ছিল ব্যাপক। এই কমিউনিষ্ট প্রসারকে রোধ করবার জন্যই আমেরিকা সর্বাঙ্গক চেষ্টা করেছিল। এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের তিন মিলিয়ন লোক নিহত হয় এবং কম্বোডিয়ার—দুই থেকে তিন মিলিয়ন নিহত হয়। আমেরিকার প্রায় ৫৮ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিষ্ট সরকার এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিয়েত কং রা দক্ষিণ ভিয়েতনামের দক্ষিণ পন্থী শাসক এবং তার সাহায্যকারী আমেরিকাকে পরাস্ত করে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে, যদিও ১৯৬৫ থেকেই আমেরিকা তার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে। ১৯৬৮ সালে এই যুদ্ধ প্রায় একটা চূড়ান্ত রূপ পায়। এই যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের তত্ত্বাবধানে যে যুদ্ধ তাতে আমেরিকা পরাস্ত হল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্ত হল। ভিয়েতনামের এই জয়ে পৃথিবীর যে সব দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন চলছিল তারা উৎসাহিত হয়—আমেরিকার মত বৃহৎ শক্তিকে যে ছোট দেশের সৈনিকেরা পরাজিত করতে পারে—তা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। আমেরিকার মত বৃহৎ শক্তিকে গেরিলা যুদ্ধের রীতিতে পরাজিত করা সম্ভব হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্দোলন কারীরা মনে জোর পায়। তাদের সামান্য শক্তি দিয়ে জনমুক্তির যে লড়াই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে—তাতে জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীর কমিউনিষ্টদের কাছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের এই সাফল্য তাদের আত্মশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকা এই যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের উপরে প্রবল অত্যাচার চালায়। বিমান হানা, বোমাবর্ষণ এবং স্থল বাহিনীর আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। উত্তর ভিয়েতনামের সাধারণ কৃষক থেকে নাগরিক রাইফেল হাতে আমেরিকার বিমান হানার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আমেরিকার বিধ্বংসী নাপাম বোমা ও আরও অনেক বিষাক্ত গ্যাসবর্ষী বোমায ভিয়েতনামের মানুষেরা অনেকে নিহত হয়, অনেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাছাড়া যুদ্ধকালীন মার্কিন

সৈন্যবাহিনীর নারী পুরুষ শিশুদের উপর সীমাহীন অত্যাচার সে সময়কার কাজগুণলিতে প্রকাশিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানবতাবাদী মানুষের ধিক্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

উৎপল দত্ত ছিলেন মনে প্রাণে কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং কমিউনিষ্টদের আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সম্ভাব্য বিপ্লবের অগ্রপথিক। তিনি তাঁর নাটকগুলিকে জনমোহিনী কাহিনীতে সাজিয়ে কেবল মনোরঞ্জন করবার কাজ করেননি। তাঁর প্রত্যেকটি নাটক ছিল উদ্দেশ্যমুখী, গণচেতনা প্রসারের এবং বিপ্লব সংগঠনের লক্ষ্যবাহী। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকটিও তিনি সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে রচনা করেছেন। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকটি লিটল থিয়েটার গ্রুপ ১৯৬৬ খ্রিঃ অভিনয় করে। তখন যুদ্ধ এবং মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার তুঙ্গে উঠেছে। যুদ্ধের ফলাফল তখনও অনির্দিষ্ট। সায়গণের পতন তখনো অনেকদূর। এই নাটকে তিনি মার্কিন বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনীর পাশাপাশি ভিয়েতনামী যোদ্ধাদের চিত্র এঁকে তাদের প্রতিরোধ শক্তি এবং দৃঢ় লক্ষ্যকে তুলে ধরেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাদের নৃশংসতা সত্ত্বেও সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার একটা সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকটিতে। মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনীর এই লড়াই যেন দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই।

নাট্যঘটনায় দেখা যায় ভিয়েতনামের সায়গণ শহর থেকে বত্রিশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত কু-চি শহর আমেরিকানরা দখল করে এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির ধ্বংস করবার জন্য হো-বো গ্রাম আক্রমণ করে। যত্র-তত্র বোমা ফেলে, গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়। এরকম এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতেও কাস্ত্রো বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। কাস্ত্রো বাহিনী ত্রাং-বাং প্রদেশে বাহিনীর সঙ্গে ভিয়েতনাম পিপলস্ মিলিশিয়ার সৈনিকরাও যোগ দেয়।

নাটকটিতে ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক বাহিনীর নগ্ন হামলা, নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার নানা ভাষা সন্ধান করেছেন নাট্যকার। মার্কিনী অগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তাই এমন তীব্রভাষায় সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে। যার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতিকেই আঘাত করা হয়েছে। মার্কিন জেনারেল ফিটস কোণ্টন যখন বলেন— “মার্কিন সরকারের নির্দেশ... কিল অল, বার্ণ অল, ডেস্ট্রয় অল। আমরা জানি এ যুদ্ধে জিততে পারবোনা। কিন্তু এশিয়ার বুক্রে এমন দাগ রেখে যেতে হবে... এমন বীভৎস একটা ক্ষত রেখে যেতে হবে... কাউকে রেহাই দেবেন না... মেয়েগুলোকে ধরে, স্তন ছিঁড়ে... দেশটার নাড়ি ভুঁড়ি বার করে দিন।”^{১৫৪} তখন প্রত্যেক দর্শকের মনে আমেরিকার সৈন্যদের অত্যাচার প্রবণ মনের পরিচয় স্পষ্ট

হয়। নাট্যকার মার্কিন আগ্রাসনের প্রতি দর্শকদের তীব্র বিরাগ সৃষ্টির কাজ এই ভাবে তাদের অত্যাচার ও পীড়নের বর্ণনা দিয়ে এঁকেছেন।

হো-বো গ্রামে ডাঃ ভিন এর হাসপাতালে দু'জন নেতাকে তল্লাস করতে এসে মার্কিন সেনারা হাসপাতালটিকে আক্রমণ করে। বিভিন্ন জিনিস পত্র ভাঙচুর করে। মার্কিন সেনাপতি হুইলার ও নাইট দু'জনে মিলে ডাক্তার ভিনের নার্স মাওকে ধর্ষণ করে। পাঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা কিম ও তার অল্পবয়সী নাতনিকেও ধর্ষণ করে মার্কিন সেনা। মার্কিনীদের এরকম নির্লজ্জ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ডাক্তার ভিন ও নার্স মাও এর কণ্ঠে। ভিন বলেন— “কর্নেল, আপনাদের দেশে মা আছে? শিশু? ঠাকুরমা? নাতনি? মানে আপনারা কি যথারীতি মায়ের গর্ভে জন্মান, না বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভূমিষ্ট হন?”^{১৫৫}

কিম এর নাতনি বুই তীব্রভাবে ঝিক্কার জানায় মার্কিন সেনাদের—“তোদের মা নেই। তোদের বোন নেই। থাকতে পারে না। থাকলে এ হতে পারতো না।”^{১৫৬}

আবার বৃদ্ধা কিম ভিয়েতনামের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে সমগ্র এশিয়ার শোষিত অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে জানাতে চান—“জনগণ বুঝবে যে ভিয়েতনাম লড়ছে সারা এশিয়ার লড়াইভিয়েতনামের রাস্তাই এশিয়ার প্রত্যেক দেশের রাস্তা। মার্কিনরা ঢুকবেই সেখানে তখন এই আমাদের মতনই অস্ত্র হাতে করে জনযুদ্ধ চালাতে হবে প্রত্যেক দেশের মানুষকে। সে দিন এল বলে।”^{১৫৭}

‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকটি মোট তিনটি ভাগে সাজানো। একে তিন অঙ্ক বলা যেতে পারে। প্রথম অঙ্ক সাইগনের কিছু দূরে কু-চি শহর। সাইগনের সরকার আমেরিকার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। ভিয়েত কং বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৃহৎ তখন মুক্তাঞ্চল। জেনারেল ফিট্‌স্‌ কোণ্টনের কথায় ম্যাপের লাল অংশগুলো আর সাইগণ সরকারের হাতে নেই, কেবল কালো কটা বিন্দুর উপরেই মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় আছে।

তিন অঙ্কের নাটকেও প্রথম অঙ্কে কু-চি শহরে মার্কিন হেডকোয়ার্টারের দৃশ্য। তারা মুক্ত হো-বো গ্রাম দখল করবার পরিকল্পনা করছে। জেনারেল এই পরিকল্পনার কথা চারজন সামরিক অফিসারকে জানাচ্ছেন। হো-বো গ্রাম দখলের পরিকল্পনা করতে গিয়েই জেনারেল অত্যন্ত উশ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়েছেন। তিনি দেবরাজ থেকে মদ ঢেলে খান, তার সঙ্গে দুটি বড়ি। এগুলো নাভ ঠিক রাখার ওষুধ। কিন্তু তিনি সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর উদ্বেগ গোপন রাখতে পারেন নি। নাটকে যেহেতু যুদ্ধে বিপর্যস্ত ভিয়েতনাম দেশটির পরিচয় একটু দেওয়া দরকার—এবং এই নাটকে সে কাজ করবার জন্য পৃথক কোনো দৃশ্য নাট্যিক ঐক্য নষ্ট করতে

পারে-সেজন্য নাট্যকার জেনারেল ফিট্‌স্‌ কোণ্টন এর অভিজ্ঞতার বর্ণনাকেই কাজে লাগিয়েছেন। জেনারেল অনেকদিন ভিয়েতনাম যুদ্ধে কাজ করবার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা তিনি আমেরিকা থেকে সদ্য আগত দর্পিত যুবক অফিসার মার্ক হুইলার ও অন্যান্যদের জানাচ্ছেন। মুক্ত এলাকা বলে চিহ্নিত বৃহৎ ভূ-খণ্ডে ভিয়েতনামের গঠনকার্য চলছে। চাষীদের জমি বিলি করা হয়েছে। ঋণ মুকুব হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে। অসংখ্য ইস্কুল খোলা হয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল আছে। চলচ্চিত্র সংস্থা অনেকগুলি চিত্র প্রযোজনা করেছে। অনেকগুলি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। নাট্যকার জেনারেলের মুখে এই বর্ণনা দেবার পাশাপাশি তাঁর নিজের কথাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন—

“মূর্খ এশীয় চাষী বলতে যা বোঝায় সে মালটিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না দক্ষিণ ভিয়েতনামে।”^{১৫৮}

জেনারেলের এই উক্তি মধ্য আমরা উৎপল দত্তের সমাজ গঠন চিন্তার পরিচয় পাই। আর মনে হয় এর প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে যেন অভিনেতা উৎপল দত্তের কণ্ঠস্বর ফুটে উঠছে। এর বিপরীত দিকে জেনারেলের কথায় ফুটে উঠছে আমেরিকার দৈন্য এবং হতাশার ছবি। জেনারেল হো- বো গ্রাম দখল করতে যে অফিসারদের দায়িত্ব দিচ্ছেন তাদের দুটি প্রশ্ন করছেন—

এক. আপনার কি যৌন ব্যাধি আছে?

দুই. আপনার কি রাতে ঘুম হয়?

নবাগত হুইলার বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করেছেন ‘এ প্রশ্নের অর্থ?’ জেনারেলের কথায় এর উত্তর আমরা শুনছি—

‘প্রতি চারজন আমেরিক্যানের একজন যৌন ব্যাধিগ্রস্ত’ এবং দুনিয়ার মোট ঘুমের ওষুধের দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই খেয়ে থাকে।’

জেনারেলের মুখ থেকে আমরা জানতে পারছি ‘কাউফম্যান’ তখনই ক্লান্ত বোধ করছেন ‘একটু হুইস্কি’ খেতে চাইছেন। এই দৈন্য ও ক্লান্তির পাশাপাশি জেনারেলের কথা থেকে জানতে পারছি সেনানায়কদের উদ্বেগের কথা—দুই ভিয়েতনামী গেরিলা ত্রাক আর দুইয়েতের ভয়ে এঁরা কেঁপে উঠছেন। জেনারেলের কথা থেকে আমরা জানতে পারি ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের উপর আমেরিকান সৈন্যদের অত্যাচার পীড়নের বিবরণ।

‘প্রথম-ছুরি, একটু একটু ক’রে ঢুকিয়ে। দ্বিতীয়-কাঁটাতারের ফাঁস, গলায় পরিয়ে চাপ। তৃতীয়-বন্দুকের কুঁদো দিয়ে হাতের আঙুল ছেঁচে দেওয়া।

জেনারেলের উক্তিতে জানতে পারছি গ্রামবাসীরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না কিন্তু তাদের

যন্ত্রণা দিতে হবে। ‘টর্চার থেকে গবেষণার আনন্দ যদি না পান হলে উলঙ্গ দেহগুলোকে ছুঁফুঁ করতে দেখে যদি একটা বৈজ্ঞানিক শিহরণ না জাগে শিরদাঁড়ায়, তবে বুঝবেন ভিয়েতনামে লড়াবার মতন স্নায়ু তৈরী করা হয়নি এখনো।’^{১৫৯}

জেনারেল এরপর নির্বিকার ভঙ্গীতে অত্যাচারের অন্যান্য সূত্রগুলির বর্ণনা দেন—

‘চতুর্থ- চোখের সামনে ফ্লেমথ্রোয়ারের ফিউম ছেড়ে চোখ গলিয়ে দেওয়া, পঞ্চম থেকে একাদশ-মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি, যথা মায়ের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বা অন্যান্য আত্মীয়দের সামনে আত্মীয়কে নির্যাতন। অত্যাচারের দ্বাদশ বিষয়টি মার্কিন মিলিটারী ইনস্টেলিজেন্সের আবিষ্কার—ইলেকট্রিক শক—মেয়েদের স্তনে আর পুরুষদের জননেদ্রিয়ে।’

লক্ষণীয় মার্কিন জেনারেলের মুখ দিয়ে নাট্যকার এই অত্যাচারের বিবরণ দিচ্ছেন। এতে একটা ইলুসন তৈরি করা হয়েছে যেন, জেনারেল প্রকৃতই সামরিক অফিসারদের ভিয়েতনামে কী ধরণের কাজ করতে হবে তার একটা নির্দেশিকা জানিয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে উৎপল দত্ত নাট্যকার হিসেবে তাঁর দর্শকদের কাছে বাঙ্গালী ও বিশ্ব নাট্যদর্শকদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচার ও পীড়নের। ‘জেনারেল’ চরিত্রটিতে উৎপল দত্ত নিজে অভিনয় করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, উচ্চারণের ওঠা নামা—বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর শ্বাসাঘাত প্রয়োগ থেকে একটা নিহিত বিদ্রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এভাবে জেনারেলের কথার মাধ্যমে মার্কিন অত্যাচারের চিত্র এবং তার প্রতি বিদ্রূপ একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

মার্কিন সৈন্য বাহিনীর চিত্র প্রথম অঙ্কে দেখাবার পর ২য় অঙ্কে ভিয়েতনামের হো-বো গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যে হো-বো গ্রাম দখলের লক্ষ্যে মার্কিন বাহিনী এত পরিকল্পনা করছে—এমন উদ্দিগ্ন ও সম্বস্ত হয়ে পড়েছে—সেই হো-বো গ্রামে পাহাড় কেটে গড়া একটি হাসপাতালের দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পর্দা উঠছে সাইরেনের শব্দ আর আঙনের লেলিহান শিখার আভার ভিতর দিয়ে। কিন্তু গোটা অঙ্কটিতে দেখতে পাই নির্ভীক ভিয়েতনামী যোদ্ধাদের প্রতিদিনকার স্বাভাবিক চিত্র। একটি হাসপাতাল সন্নিহিত অংশকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় অঙ্কটি গড়ে উঠেছে। নাটকের গঠনশৈথিল্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে এখানেই দেখানো হয়েছে বিপ্লবী আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা, তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীর যোগাযোগ আবার সেই হাসপাতালেরই একটি অংশে আসন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনা। এই অঙ্ক/দৃশ্যটির পাত্রপাত্রীরা সকলেই অত্যন্ত casual ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে চলেছে। হাসি ঠাট্টা কৌতুক সবই মেশানো আছে তাদের সংলাপে। আবার আসন্ন মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনাও হচ্ছে এই সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে। কোথাও একটুও tension নেই, একটুও আতঙ্ক নেই একটুও অস্থিরতার

চিহ্ন নেই। মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা বলাৎকারকে মেয়েরা সহজ বলে মেনে নিয়েছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকও চিকিৎসার জন্য বা বিশ্রাম করে সময় নষ্ট করতে চায় না। চিকিৎসার পাশাপাশি ডাক্তার ভিন দক্ষিণ ভিয়েতনামের জমির ফসল নষ্ট করবার জন্য মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত ক্লোরোসিসের প্রতিষেধক তৈরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তার মধ্যেই নার্স ন্গুয়েন থি মাও এবং বিপ্লবী যোদ্ধা দুইয়েং এর প্রণয় সম্পর্কের একটু করে অনুরাগী মুহূর্তেরও সন্নিবেশ ঘটিয়ে দেন একই দৃশ্যে। আসলে নাট্যকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে মার্কিন হানার বিরুদ্ধে মুক্তিফৌজের যুদ্ধ বর্ণনায় নয় বরং কীভাবে মুক্তাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা চলছে তা দেখানোয়। তারই সঙ্গে তারা যে মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছে—তাদের পেষণ-পীড়ন সহ্য করছে তাদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে তার ছবিও পরের অঙ্কে/দৃশ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন। প্রথম দুই দৃশ্য পৃথক পৃথক ভাবে মার্কিন ফৌজীক্যাম্প ও ভিয়েতনামের হাসপাতাল সংলগ্ন মানুষের জীবন চিত্রণ। তৃতীয় দৃশ্যে উভয়ের সংঘাত এবং তার পরিণাম। তৃতীয় অঙ্ক/দৃশ্যে আমরা হাসপাতালে পৌঁছতে দেখি মার্কিন ফৌজের সেনানায়ক হুইলার ও অন্যান্যদের। তাদের সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার নার্স ও রোগীদের কথাবার্তা এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে নার্স মাওকে ধর্ষণ ও হত্যা-মাতাপিতা হীন একটি বালিকাকে হত্যা করা, ডাক্তার ভিনকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পীড়ন করে তার চোখে বিষাক্ত গ্যাস স্প্রে করে অন্ধ করে দেওয়া—এসবই অত্যন্ত সহজ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার ভিয়েতনামের জনসাধারণকে একই সঙ্গে বিপ্লবী যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছেন। ডাক্তার ভিন আবার পণমুক্তি ফৌজের এই এলাকার সভাপতি। অশীতিপর বৃদ্ধা মাদাম কিম বন্দুক চালিয়ে বোমারু বিমানকে নামিয়ে ফেলেন। নাট্যকার দৃশ্য শুরুর প্রথমেই বলে দিয়েছেন “সশস্ত্র গ্রামবাসীরা অত্যন্ত শান্তভাবে নদীর ধারে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে।”^{১৬০} একদিকে শান্ত ভাবে প্রস্তুতি এবং তৃতীয় দৃশ্যের শেষে দেখি ভিয়েং কংরা দুর্ধর্ষ মার্কিন সৈন্যদের খতম করে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে মার্কিন পক্ষে উদ্বেগ হতাশা এবং হতাশাজনিত কারণে মাত্রাছাড়া অত্যাচার চালানো হচ্ছে। নাট্যকার ২য় দৃশ্যে/অঙ্কে ‘মুয়ন’ এর মুখোসে কথাটা বলিয়ে দিয়েছেন।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ এ নাটকের বিষয় হলেও নাটকটির ভাববস্তুতে যেন এদেশের সমকাল বিরাজিত। ভিয়েতনামীদের এই প্রতিরোধ এ লড়াই যেন দুনিয়ার প্রতিটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষও যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সে সময় সরকারি খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পুলিশের গুলিতে সেদিন প্রাণ হারিয়েছিল প্রতিবাদী যুবক। চীন-ভারত যুদ্ধ এবং পাক-ভারত যুদ্ধকে উপলক্ষ করে

সে সময়ে বহু বামপন্থী নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

“শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রত্যাশী সাধারণ মানুষের সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার এই সংঘাতের ফলে দেশব্যাপী সরকার ও বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চেতনা দ্রুত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। সেই সময়ে ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকটি যেন দেশজ মুক্তির সুর ছড়িয়ে দেয়।”^{১৬১}

তীর : উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি এলাকার কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত হয় উৎপল দত্তের বহু বিতর্কিত নাটক ‘তীর’। নকশালবাড়ির নিকটবর্তী গ্রাম প্রসাদু জোতে পুলিশের গুলিতে এগারো জন কৃষক পরিবারের সদস্য নিহত হয়েছিল। সেদিনকার সে ঘটনাকে অবলম্বন করেই এ নাটকের আত্মপ্রকাশ। সেদিন তীর ধনুক হাতে নিয়ে জীবন পণ করে জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল নিজেদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে, উৎপল দত্ত নকশালবাড়ির সে সকল বীর কৃষক যোদ্ধাদের সম্মানিত করেছেন ‘তীর’ নাটকের মাধ্যমে।

‘Theatre as weapon of Revolution’ প্রবন্ধে উৎপল দত্ত প্রশ্ন তুলেছেন ‘What Should the Revolutionary theatre say?’ এবং এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন “Party’s general line at any particular epoch must be echoed exactly in the revolutionary theatre.”^{১৬২} কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন এই পথ থেকে সরে আসা দরকার। তিনি ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুসরণ করে লেখা তাঁর নাটকের প্রসঙ্গে বলেছেন “Many of our plays were mere canvassing for votes”^{১৬৩} একথা তিনি বুঝেছিলেন যে এই পার্টি লাইন অনুসরণ করে ভোটের রাস্তায় গেলে বিপ্লবী নাটকের সারবত্তা থাকবে না। কারণ পার্টির লাইনে তখন ‘armed struggle’ ছিল না এবং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বললে হয়তো ভোট পাওয়া যাবে না (might lose votes) এই কারণে তা বর্জিত হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী থিয়েটার প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত এই মত থেকে সরে এসেছিলেন।

“We realised now that, irrespective of party policy of the time every incident of heroism of the masses is material for drama. It is our duty above all to capture every event of our time when the people have taken up arms against the oppressors and re-tell these stories again and again to inspire the masses.”^{১৬৪}

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ‘তীর’ নাটক লেখা।

‘তীর’ নাটকের রাজনৈতিক পটভূমি উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই উদ্ধৃত জমি দখলের যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা বৃদ্ধি পায়। প্রধানত মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের একটি অংশ এতে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে মতভেদ প্রকাশ্যে দেখা যায়। যার ফলে ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই ও সি.পি.এম দুটি দল তৈরি হয়। সি.পি.এম. দলে অপেক্ষাকৃত বেশি বিপ্লববাদে বিশ্বাসী মানুষ যোগ দেয়। ১৯৬৪-র পর থেকেই কিন্তু সি.পি.এম এর মধ্যেই আর একটা উপদল তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখ এই উপদলের মানুষ। দলের ভিতরে আরও অনেকেই বিপ্লব সংগঠনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সি.পি.আই কে সংশোধনবাদী নাম দিয়ে এরা লেনিন মাওসেতুং এর মতাদর্শে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা ভাবছিলেন। ১৯৬৫ সালে চারু মজুমদার তাঁর বিখ্যাত ‘Historic Document’ রচনা করতে শুরু করেন। এ থেকে বোঝা যায় ১৯৬৫ সাল থেকেই তিনি দলীয় চিন্তার বাইরে গিয়ে বিপ্লবের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। চারু মজুমদারের এই Document-এর প্রথমটিতেই ছোট ছোট activist group তৈরি করে আন্দোলন করার কথা বলা হয়েছিল। এই উপদলটি বিশেষ করে মাও-সে-তুং-এর বিপ্লবী পন্থা অনুসরণ করে ভারতবর্ষে কৃষি বিপ্লব করবার কথা বলেছিলেন। চারু মজুমদার এর মতো আরো অনেকেই মনে করতেন ভারতবর্ষে মার্কিন উপনিবেশবাদ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তাতে আমাদের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। যাইহোক আন্দোলনের ডাক ১৯৬৫ সালে তাত্ত্বিক ভাবে দেওয়া হলেও ১৯৬৭ সালের আগে - বিশেষত বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে শুরু হয়নি। সে আন্দোলন ও সর্বাঙ্গিক বিপ্লব অপেক্ষা উদ্ধৃত জমি দখলের লড়াই হিসেবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পেল ২৫শে মার্চ প্রসাদু জোতে পুলিশের গুলিতে ৮ জন নারী ২ জন শিশু ও ১ জন পুরুষ মোট এগার জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এই গুলি চালনার আগে উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে জমি দখলের লড়াই শুরু হয়েছিল। একজন জোতদার রবি মিত্র কৃষক সভার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে নিহত হয়। সে সব ঘটনা তেমন দাগ কাটেনি। কিন্তু প্রায় নিরস্ত্র মহিলাদের উপর অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে গুলি চালনার ঘটনা বাংলা ও ভারতের নানা অঞ্চলে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

উৎপল দত্ত তখন ‘অঙ্গার’ করেছেন ‘ফেরারী ফৌজ’ করেছেন ‘কল্লোল’ করেছেন। বিপ্লবী থিয়েটার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন “every incident of heroism of the masses is material for drama”^{১৬} যাঁরা বলছিলেন “leaders of the Naxalbari uprising were adventurist” তিনি তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি বরং মনে করতেন

revolutionary theatre এর কাজ revolutionary Ideology-র প্রসার। কাজেই নকশালবাড়ির কৃষকদের এই বিপ্লবী আন্দোলনকে তিনি নাটকের বিষয়বস্তু করে যে নাটক লিখলেন তার লক্ষ্য হল গ্রামীণ নাগরিক মধ্যবিত্ত নাট্যদর্শকের চেতনা বিস্তার এবং শ্রমিক কৃষকের উপর জোতদার পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার সর্বসমক্ষে তুলে ধরা। এই কাজে ‘তীর’ নাটকটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬৭ সালে উৎপল দত্ত যখন ‘তীর’ নাটক লেখেন তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারণ করেছিল। নভেম্বর মাসে বাম ও মধ্যপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হয়। এ সময়ের উৎপল দত্তের সঙ্গে সি.পি.আই (এম) এর মতবিরোধ ঘটে। উৎপল দত্ত সহ অনেক সি. পি. আই. (এম) নেতা কর্মী বিক্ষুব্ধ হয়ে নকশাল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।^{১৬৭} প্রসাদু জোতে পুলিশের গুলিতে ১১জন কৃষকরমণী শিশু ও পুরুষের মৃত্যুর খবর চারিদিকে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। নকশাল বাড়ির আন্দোলনের সমর্থনে কোলকাতায় নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি গড়ে ওঠে। এসময়ে ‘সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা’ নামে একটি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গঠন করেন উৎপল দত্ত।

‘তীর’ নাটকে বিশেষ রাজনীতির দর্শনটি স্পষ্ট, যার মূল কথাগুলি ঘুরে ফিরে বারবার করে উচ্চারিত হয়েছে চরিত্রদের সংলাপে। মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র চাই, কান্না নয়, প্রার্থনা নয়, অস্ত্র চাই ইত্যাদি। এটি ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নকশাল পন্থার সমর্থনে ত্বরিত নাট্যপ্রতিক্রিয়া। অবশ্য পরবর্তী কালে নাট্যকার এ নাটকটিকে ‘শোচনীয় ভ্রান্তি’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে নাট্যকার এক লেখায় জানিয়েছেন—“আমি নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক নই কারণ চীন সে আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ ছিল ভুল, এক ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করে আমাদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।”^{১৬৮} তবে বিপ্লবী রাজনীতি এবং বিপ্লবী আশাবাদ এ নাটকে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার প্রসাদ গাঁয়ের প্রজারা মাদল বাজিয়ে সশস্ত্র মিছিল করছে। প্রসাদ গাঁয়ের জমিদার সত্যবান সিংহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এই প্রজারা। এরা চীনের মাওসেতুং -এর আদর্শ মেনে আন্দোলন করছে নিজেদের মুক্তির জন্য। এদের দুই নেতা দেবীদাস ও শিবেন রায় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, তাই এদের দু’জনকে তারা অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছে।

দেবীদাস ও শিবেন রায়কে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় অন্তোশ্বরী। ১৯৬২ সালে শিবেন ছয় মাস লুকিয়ে ছিল। এসময়ে শিবেনকে আশ্রয় দেবার জন্যই অন্তোশ্বরীর ওপর জোতদারের

লোকেরা অত্যাচার করে। তার মুখে আগুনের ছাঁকা দেয়। ফলে অন্তঃশ্বরী অন্ধ হয়ে যায়। আজ তাদের নেতাকে পেয়ে অন্তঃশ্বরী প্রতিশোধের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। শিবেনকে দিয়ে সে কবুল করায়—“বাপো শিবেন! এই সত্যবানকে আমার সামনে গাছে বেঁধে মারবিতো? কথা দে-বল্ না বাপো -”^{১৬৯}

সত্যবান এতদিন কংগ্রেসী ছিল। এখন সে যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেছে। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তাকে জয়ী করবার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। বিলাসবহুল তার জীবন যাপন। উপপত্নী বিমেশ্বরীর জন্য সে ৩২ ভরি সোনা দিয়ে হার তৈরি করে দেয়। অথচ তারই ইঙ্গিতে তার কর্মচারী বৃক্ষ শ্রমিকদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। খাতায় ভুল হিসেব লিখে প্রজাদের শোষণ করছে। এই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রজাদেরকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। গেরিয়েল নামক এক প্রজা তাই বৃক্ষকে জানায়—“খাতায় ভুল লেখা আছে। ... তাহলে জোচ্ছুরি করা হচ্ছে। ... তীর মেরে বুকো ছাদা করে দেব, বৃক্ষবাবু, বেশি যদি খচরামি করেন। টাকা দিন।”^{১৭০} সমারি ও অন্যান্য প্রজারাও এ রকম ত্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছে।

শুধু তাই নয় মিথ্যা ডিক্রি করে জমিদার সত্যবান অনেক প্রজার জমি দখল করে নিয়েছে। এরকম একজন নিঃস্ব প্রজা কেরকেটু।

এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়েছে। সুকদেও, গেরিয়েল জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়। শুক্রা টুডুকে দেখা যায় সত্যবানের পোস্টারকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

দেবীদাসের নেতৃত্বে গোপনে মাওসেতুং-এর জনযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা চলছে। পুরোদমে প্রশিক্ষণ চলে। এক সময় সমস্ত প্রজারা মিলে সত্যবানের বাড়ি আক্রমণ করে। প্রজারা তাদের সংগঠনের নাম দেয়-‘আঞ্চলিক বিপ্লবী পরিষদ’। সত্যবানকে উচ্ছেদ করে তার সমস্ত সম্পত্তি বিপ্লবী পরিষদের জন্য দখল করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র গুলোও পরিষদ দখল করে নেয় এবং একুশ’শ বিঘা জমি প্রজাদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। শুধু কৃষকরাই নয়। চা বাগানের প্রায় সব শ্রমিক এবং রেলের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ শ্রমিক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ‘সন্ন্যাসীস্থান’ টি এস্টেটের কোয়ার্টার ভেঙে কৃষকরা চাষের জমি তৈরি করেছে। পুলিশ ঝড়ু জোত, ভাটা জোত, প্রসাদু জোত, হুচাই মল্লিক জোত, রামবোলো জোত, ভরিয়া জোত থেকে জনতার তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। বুড়াগঞ্জের সমস্ত জমি কৃষক শ্রমিকদের দখলে যায়। গঙ্গারাম টি এস্টেটের শ্রমিক কৃষকরা এক সঙ্গে এসব জমি দখল করে নেয়।

১৯৬৭ সালের ২৬শে মে, তিস্তাবুড়ী পূজাতে গ্রামের সমস্ত মহিলারা উপস্থিত হয়। সত্যবানের নির্দেশে পুলিশ পূজারত মহিলাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে অনেক মহিলা নিহত ও আহত হয়। এঘটনায় দেবী দাস আশাহত হয়ে ভেঙে পড়লে সানঝো তীব্র প্রতিবাদ করে। জোতদার, পুলিশ সরকারের প্রতি তার হিংসা ও ক্ষোভ প্রকাশ পায় জ্বালাময়ী ভাষায়—

“আমরা এ চাইনি, কিন্তু ওরা আমাদের শিখিয়ে দিল, ঘৃণা কাকে বলে, রাগ কাকে বলে। তাই এইবার ওরা দেখবে, রক্তপাত কাকে বলে, এরপর আর কেউ যেন নাকে কান্না না কাঁদে রক্তপাত হচ্ছে কৃষকরা মারছে, কৃষকদের শত্রুর রক্তে ওরাই লাল করে দিচ্ছে। আর তো ছাড়বোনা! সবাইকে মারবো—দেখবো আর মারবো— সব জোতদার, মালিক, পুলিশ- সব দালাল - আর সব বেইমানদের।”^{১৭১}

সানঝো সমস্ত কৃষক শ্রমিকদের নৃশংস ও নির্মম হতে বলে এবং সন্ত্রাসের প্রতিশোধের বার্তা জানায়। তার কণ্ঠে যেন প্রতিবাদের বারুদ বিস্ফারিত হতে থাকে।

প্রসাদু জোতের নারী শিশু হত্যার প্রতিবাদে সেদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিলও বের হয়।^{১৭২}

রামবোলো জোতের অরণ্যে গভীর রাতে পুলিশ আক্রমণ চালায়। পুলিশ এ অপারেশানের নাম দিয়েছে ‘অপারেশান ডবল স্টার’। খবর পেয়ে রাইমতী জোতের আন্দোলনকারীরা রামবোলো জোতের বনে আসে। তীরের আঘাতে ক্রমশ পুলিশের গাড়ির সার্চলাইট ভাঙে, বারুদ ভর্তি আর্মস ডাম্প বাস্ট হয়ে যায়। কুলির ছদ্মবেশে জনাকু সত্যবানকে কৌশলে পাঁকের মধ্যে নিয়ে যায়। সত্যবান পাঁকের মধ্যে পুঁতে যেতে থাকে এসময় সবাই তাকে ব্যঙ্গ করে এবং ভদ্রভাবে নির্মমতা দেখায়। সত্যবানের প্রতি জনাকুর শেষ উক্তি—“কী হলো? বলে যান, বাবু, শিক্ষা কেমন পেয়েছি? ...আপনাদের ভদ্র, নিষ্করণ বিবেক হীনতা কেমন শিখেছি বলে গেলেন না? ... ওদের মতন নিষ্ঠুর না হতে পারলে ওদের হারাবো কী করে?”^{১৭২}

অত্যাচারী জোতদার ও রাষ্ট্র শক্তির হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিনকার আদিবাসী প্রান্তিক কৃষক, ক্ষেতমজুর, চা-শ্রমিক প্রভৃতি খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের সেই দুর্জয় সাহস ও মরণপণ লড়াইকে নাট্যকার শিল্প নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতি সেদিনকার একটি বিশেষ সংশয়কে প্রভাবিত এবং উদ্দীপিত করলেও সমাজের ব্যাপক অংশই মনে প্রাণে তা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু এ নাটকের লড়াই যে অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, জুলুমবাজ, জোতদারদের বিরুদ্ধে এবং এর মধ্যে দিয়ে যে একটি মানবতাবাদী

শোষণ হীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তা অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটকটির গুরুত্বও যেমন দর্শকদের কাছে অপরিসীম তেমনি রাজনৈতিক ধারার ইতিহাসে তা অনন্যসাধারণ।

‘তীর’ নাটক উৎপল দত্তের নিজের মতে revolutionary Ideology প্রচারের নাটক। এজন্য এ নাটকে অনেকটা বিস্তৃত পট নিয়ে নাটকের পরিসর রচনা করেছেন। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে মাত্র তিনটি অঙ্কে অত্যন্ত সংহত করে ঘটনার প্রস্তাবনা থেকে পরিণতি দেখিয়েছিলেন। ‘তীর’ নাটক সে তুলনায় অনেক বিস্তৃত এবং শিথিল। নাটকটি ১৪টি অংশে বিভক্ত। এই ১৪টি অংশের ১০টির পৃথক শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। ১০ নং অংশটি আবার ২৫ ও ২৬ মে দু’দিনের ঘটনায় বিভক্ত। ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত অংশের পৃথক শিরোনাম নেই। নাটকের উপস্থাপনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কোনো একটি কাহিনির বিন্যাস, বিস্তার ও পরিণাম নেই। বরং দৃশ্যের পর দৃশ্যে উত্তরবঙ্গের বহু জাতি অধ্যুষিত সমাজ বিন্যাস, তাদের জীবনচর্যা, আচার আচরণ, বিবাহ প্রথা, নৃত্য নানা জিনিস দেখানো হয়েছে। এর ভিতরে আছে জোতদারের অত্যাচার, বামপন্থী নেতার ভোটে জেতা, জোতদারের বামপন্থী দলের সঙ্গে জোট, কৃষক মজুরদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদি।

নাট্যকার ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ একটু ছুঁয়ে গেছেন। বামপন্থী নেতাদের সংশোধনবাদী চরিত্র উদঘাটিত করেছেন। পুলিশ রাজনীতিবিদ জোতদার সংবাদপত্র—ইত্যাদির রাজনৈতিক স্বরূপ তুলে ধরেছেন। নাটকের প্রথম অংশে একটা মিছিল দিয়ে প্রস্তাবনা করা হয়েছে। আর মিছিলের ভিতর থেকে শুক্রা টুডু বেরিয়ে এসে—উত্তরবঙ্গের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর ঐক্যের কথা বলেছে। সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, নেপালী, বাঙালি ইত্যাদি বহুজাতির মানুষ মিলে মিশে একসঙ্গে বাস করছে। শুক্রাটুডু বলেছে “আমাদের শ্রমের ঘর্ষণে আর ঘামের স্রোতে গায়ের রঙ লেপে মুছে একাকার... লুণ্ঠিতের আবার জাত কী”^{১৭৪} অর্থাৎ সচেতন ভাবে জাতিভেদ মুছে কৃষক বলে পরিচয় দিয়ে নাট্যকার তাদের পরিচায়িত করেছেন। এই জাতিভেদহীন কৃষক সমাজের ভিতরে এসে এবারে বন্দী মুক্ত ‘দেবী দাস’ আর ‘শিবেন রায়’। এরা বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। এদের সঙ্গে কথা সূত্রে জোতদার সত্যবান সিং-এর অত্যাচারের কথা, খুন-জখম করবার কথা এবং জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার কথা এসেছে। শিবেন একসময় ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এখানে আত্মগোপন করেছিল। সেই অপরাধে পুলিশ আর জোতদার অস্ত্রেশরীর উপর অত্যাচার করে তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। অস্ত্রেশরী এর প্রতিশোধ নিতে চায়। নাট্যকার এই অংশেই শিবেনের মুখ দিয়ে আসন্ন নির্বাচনের কথা বলিয়ে

নেন। বামপন্থী দলগুলি ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই যুক্তিই দিয়েছিল “নির্বাচনে যে
 বিপ্লব হবে, তা তো বলছি না। বলছি, এটা বিপ্লবের প্রথম ধাপ।”^{১৭৫} ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে
 দুটো ফ্রন্ট হয়েছিল। একটা সি.পি.এম. এর নেতৃত্বে আর একটা সি.পি.আই এর নেতৃত্বে। সি.পি.আই
 এর নেতৃত্বে তৈরি PULF এ কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসা বাংলা কংগ্রেসও ছিল। সি.পি.আই
 কে শোষণবাদী হিসেবে আখ্যা দিয়ে এবং বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করে সি.পি.এম. এর
 নেতৃত্বাধীন ULF ৬৮টি আসন পায়, PULF পায় ৬৫টি। কংগ্রেস ১২৭টি আসনে জেতে। এই
 অবস্থায় দুটি বাম শক্তি একত্র হয়ে যুক্ত ফ্রন্ট তৈরি করে এবং রাজ্যে মন্ত্রীসভা গঠন করে। এতে
 বামপন্থী অনেক মানুষ সি.পি.এম. দলটির উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই সুযোগে উত্তরবঙ্গে নবশালবাড়ি
 আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রথমে উদ্বৃত্ত জমি দখলের লড়াই হিসেবে শুরু হলেও পরে তা জোতদার
 পুলিশ খুন এবং স্থানীয় ক্ষমতা দখলের লড়াইতে পরিণত হয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট
 সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। কানু সান্যাল বলেছেন—“বামফ্রন্টের মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার শিলিগুড়িতে
 এসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের সঙ্গে মিটিং করলেও তাকে গোপনে আন্দোলন চালিয়ে
 যেতে বলেন।”^{১৭৬} উৎপল দত্ত ‘তীর’ নাটকে একজন মন্ত্রীর কথা লিখেছেন যিনি উত্তরবঙ্গের এই
 কৃষক মজুরদের কাছে জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই এর প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা
 করেননি। এলাকার জোতদার সত্যবান সিং একজন কংগ্রেসী সমর্থক ছিল। এবার সে বাংলা
 কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বামফ্রন্টের শরিক হয়ে পড়ে। নাট্যকার দ্বিতীয় অংশে (অঙ্কে ?) সত্যবান সিং
 এর দপ্তরে কৃষক মজুরদের উপর শোষণের একটি ছবি দিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে প্রথম অভিনীত
 ‘দেবীগর্জন’ নাটকে বিজন ভট্টাচার্য যে চিত্রটি দিয়েছেন এটি তারই অনুরূপ বরং একটু বেশি
 উদ্দেশ্যপ্রবণ। এর শেষ অংশে দেখি সত্যবান সিং প্রজাদের সর্বস্ব শোষণ করে নিয়ে বলছে—
 “তোমরা নখদস্তহীন জন্তু। তাই এবার আমরা মারবো।”^{১৭৭} সত্যবান এখন যুক্তফ্রন্টের ভোটে
 দাঁড়াচ্ছে—প্রজাকল্যাণ তার বক্তৃতার লক্ষ্য—প্রজাশোষণ ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধি তার আসল
 উদ্দেশ্য। তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার রাজবংশী সমাজের বিবাহ বর্ণনা এবং কীভাবে প্রজার ভিটে মাটি
 থেকে তাকে উৎখাত করে জোতদার তাকে শেষ করে দেয় তার দুই বিপরীত চিত্র উপস্থাপনা
 করেছেন। কেরকেটুর সঙ্গে জমি নিয়ে মামলায় জোতদার সত্যবান সিং জমির দখল পেয়েছে।
 কেরকেটুকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তার উপর মামলার খরচ পর্যন্ত ধার্য করেছে। এতে
 কেরকেটুর ছেলের সঙ্গে বৈশাণুর মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে পণের টাকা দিতে না পারার কারণে।
 আর বৈশাণুর মেয়ে দেবারী কেরকেটুর ছেলের ঘরে এসে ঢুকেছে। একে বলে পাশতুয়া হওয়া।
 নাট্যকার এই অংশের নাম দিয়েছেন ‘ঘরসন্ধানী বিবাহ’। নাটকের দিক থেকে এই অংশের গুরুত্ব

বিশেষ কিছু নয়— কেবল লোকজীবনের চিত্ররচনা। বস্তুত উৎপল দত্ত ‘তীর’ নাটকে একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেন নি বরং উত্তরবঙ্গের লোকসমাজ, তাদের জীবনাচার, লোকঐতিহ্য বিবাহ পদ্ধতি এসবই তাদের শোষণ পীড়ন লড়াই রাজনীতির পাশাপাশি বর্ণনা করে গেছেন। ৩নং অঙ্কে/দৃশ্যে বিবাহ বর্ণনার সঙ্গে ৪নং দৃশ্যে ‘ঘরসন্ধানী বিবাহ’ বর্ণনা করা হয়েছে। ৫নং অঙ্কে/দৃশ্যে এক সঙ্গে অনেক কিছু স্থান পেয়েছে। এই অংশের নাম ‘ভোটমন্ত্র’। এখানে ভোটের প্রচার এবং স্লোগান এসেছে আলাদা ভাবে কিন্তু এই ভোটমন্ত্রকে নিয়ে সাধারণ মানুষের বিদ্রূপ এবং ক্ষুধার সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। খাদ্যাভাব অনাহার এবং ভোটের প্রচারের স্লোগান ‘ভোট দিন বাঁচতে’ কিংবা ‘দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসকে ভোট দিন’ দুইকে পাশাপাশি রেখে নাট্যকার ভোটের রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। শুক্রা ওরাওঁ-এর মুখে নাট্যকার বলিয়েছেন— ‘তুই ভোট দিবি বাঁচতে। চাল চাই বাঁচতে এমন অসম্ভব কথা এই পোস্টারে নেই!’^{১৬৮} আবার ভোটের প্রচারে শোনা যায় “খাদ্যের জন্য গণবামফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীসত্যবান সিংকে ভোট দিন।”^{১৬৯} সুকদেও ওরাওঁ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে “যে সকলকে অনাহারে রেখেছে এ ব্যাপারে তোমরা কী করলে?”^{১৭০} বির্সা ওরাওঁ এর বিদ্রূপ এর পাশে সত্যবান সিংকে ভোট দেবার আবেদন এবং সুকদেও এর প্রার্থনা—তিনটি বিপরীত ব্যাপারকে সাজিয়ে নাট্যকার রাজনীতি ও জনজীবনের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। সত্যবান সিংকে মারতে সুকদেও দেবতার কাছে প্রার্থনা করে আর জোনাকু বান মেরে তাকে শেষ করতে চায়। “জোনাকু।। বাণ মারবো। আজ রাতেই মরবো।”^{১৭১} অনাহারে অসুস্থ মানুষের খাদ্য জোগাড়ের এর চেয়ে বেশি জোর পায় অপদেবতা তাড়ানোর তুকতাক। লোকজীবনের এই সব বিশ্বাস ও আচারের দিক নাট্যকার উপেক্ষা করেননি। গোটা একটা জনজীবনের বিশ্বাস সংস্কার দেবতা অপদেবতা বাণ মারা, অপদেবতার ভর ছাড়ানো, সব নিয়েই একটা সমাজ। আবার তারই মাঝে রাজনীতি সচেতন দেবারীর মুখে নাট্যকার শোনান “এ বই-এ আছে, বাণ মেরে মেরে না-ওরা সত্যবানের চেয়ে ঢের বড় শয়তানদের শেষ ক’রে দিয়েছে। এমন বান আর হয় না।”^{১৭২} জোনাকুর মা অনাহারে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দেবারী বোঝে না খেতে পেয়ে এমন হয়েছে। জোনাকুর সে শিক্ষা নেই। সে পাজিয়ারের (পুরোহিত) কথা বিশ্বাস করে তুকতাক করতে চায়। দেবারীর উপর সে স্বামীর প্রভুত্ব খাটায়। দেবারীর রাজনৈতিক শিক্ষা যে বই পড়ে সে বই সে ছিঁড়ে ফেলে। “আমার বাড়িতে বই চলবে না—বই সহ্য করবো না”^{১৭৩}

‘৬’ নম্বর অংকটির নাম ‘যুক্তফ্রন্ট’। শিবেন মন্ত্রী হয়েছে শুনে গ্রামের লোকেরা আনন্দ করে। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া নাট্যকারের কথায় :

গজুয়া ॥ ভেতর থেকে লড়বে শিবেন বাইরে আমরা ।

রণবাহাদুর ॥ আমার অষ্টম সন্তান তেজবাহাদুর থাপা তাহলে বেঁচে গেল ?

বিসা ॥ এবার থালা থালা ভাত খাস কিস্যু বলবো না...

সানঝো ॥ বাচ্চাগুলোর খিদে আর কান্নাকাটি সহ্য করা যেত না বুঝলি ? জনগণের এই আশা-
মরিচীকার বিপরীত চিত্র একই অঙ্কে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার ।

“শিবেন রায় মাল্যভূষিত হচ্ছেন—মাল্যদান করেন, প্রথমে এক চা-বাগান মালিক, তারপর
এক জোতদার, তারপর সত্যবান সিংহ সবশেষে দেবীদাস এবং আর একজন কমরেড।”^{১৮৪}

পার্টির সদস্য আব্দুল কাদের রীতিমত বিস্মিত হয়ে দেখে শিবেন বলছে—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট
পার্টি আর বাংলা কংগ্রেস বাহুতে বাহু বেঁধে বাংলাদেশে কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান ঘটিয়েছে ।
মন্ত্রী হয়ে রিপোর্টারের প্রশ্নের উত্তরে শিবেন খাদ্য নীতি ঘোষণা করে—“মজুতদার জোতদার
অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এখনি আমরা কোনো বলপ্রয়োগ করতে চাই না । আমরা বিশ্বাস করি
মজুতদার জোতদার ও মানুষ । তাঁদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব ।”^{১৮৫}

অত্যাচারী পুলিশ অফিসার অমর মুখুজ্যে এখন শিবেনের অনুচর । শিবেনকে কমিউনিস্ট পার্টির
কর্মী কাদের জিগ্যেস করে—

আব্দুল ॥ আমরা জমি দখল শুরু ক’রে দেব ?

শিবেন ॥ তাছাড়া কী ? নইলে এতকাল কী বলে এলাম আমরা ?

আব্দুল ॥ না, সশস্ত্র পুলিশের মোকাবিলা করতে হলে—

শিবেন ॥ তাহলে আমরা মন্ত্রী সভায় ঢুকেছি কি করতে ? পুলিশ আসবে না!^{১৮৬}

এই অঙ্কের একেবারে শেষে পুলিশ সুপার অমর মুখুজ্যের মুখে নাট্যকার একটি সংলাপে এক
সময়কার বামপন্থী নেতা বর্তমান মন্ত্রী শিবেনের সংশোধনবাদী চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন ।
সত্যবান সিং এর স্ত্রী চন্দনা শিবেনকে তাদের গাড়িতে যেতে বললে শিবেন বলে “আমি জীপে
যাব ।” তখন অমরের উক্তি

অমর ॥ (হেসে) লোকে স্যারকে দেখতে চায় ! খোলা জীপে না গেলে কি চলে নাকি ?

সুন্দর ॥ (হতাশায়) য্যাঃ, স্যালা!^{১৮৬}

আগেই বলেছি ‘তীর’ নাটকের পরিসর বিস্তৃত; লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেয়ে চারিদিকের লোকসমাজ,
সংস্কৃতি, প্রজাদের দুরবস্থা, তাদের বিদ্রোহের প্রস্তুতি, সমকালীন রাজনীতির সমালোচনা সব নিয়ে
তার চলা । এই চলার ভঙ্গি অনেকটা অতুর । তিনি জনগণকে তাদের জীবন যাপনের প্রাত্যহিকতার
সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এবং সেই রাজনীতি দিয়ে সশস্ত্র

বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিতে চান। ‘৭’ নম্বর অংশের নাম ‘মাও-ৎসে-তুং-এর চিন্তা।’ এই অংশে কীভাবে ভারতবর্ষে মাও-ৎসে-তুং এর শিক্ষা অনুসরণ করে বিপ্লব সংগঠন করা সম্ভব তারই রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাও এর জনযুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে জনতার মধ্যে রাজনীতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর কাজ বামপন্থী দলগুলির একটি লক্ষ্য। চারু মজুমদারের Document অনুসারে ছোট ছোট বিপ্লবী দল গড়ে তোলা—তাদের রাজনীতি শিক্ষা এবং তাদের দিয়ে জোতদার বা প্রশাসনকে আঘাত করা—এগুলি বিপ্লবী দলের কাজ। নাট্যকার এই অংশে জনযুদ্ধের নীতি সাধারণ মানুষ কীভাবে গ্রহণ করছে গাংগীর মুখের সংলাপে তার প্রমাণ দিয়েছেন। ওরাওঁ শিকারী কেবল ছোরা নিয়ে কীভাবে হাতি শিকার করে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বিশাল শক্তির অধিকারী জোতদার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে। দেবী দাস জনযুদ্ধের নীতি শেখাতে গিয়ে বলেছিলেন শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত অঞ্চল গড়াতে হবে। সেখানকার কৃষকরাই গড়বে মুক্তি ফৌজ। এসব মুক্ত অঞ্চল ক্রমশ বড় হয়ে শহরকে ঘিরে ফেলবে। এই জনযুদ্ধের নীতির ব্যাখ্যা গাংগী দিয়েছে হাতি শিকারের রূপকে। অর্থাৎ নাট্যকার বলতে চান সাধারণ মানুষ অনেক সহজে রাজনীতির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সে কথা তিনি তার ইংরেজিতে লেখা ‘Towards a Revolutionary Theatre’ বইতেও বলেছেন। মাও-এর জনযুদ্ধের নীতি তিনি আবার দেবারীর মুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এই ভাবে জনসাধারণের নিজের পরিচিত উপমান ব্যবহার করে সুকনি আর দুকনির গল্প। কখনো বা তত্ত্বকথা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের উপযোগী করে মাও-ৎসে-তুং এর শিক্ষা সবার জন্য বলে দিয়েছেন। দেবারীর মুখে যেমন জন যুদ্ধের নীতি ব্যাখ্যা হয়েছে তেমনি কংগ্রেস সরকারের চরিত্র বিচারও হয়েছে। এই অঙ্কেই আবার চলছে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশিক্ষা। এবং এই পরিবেশেই খবর আসে সত্যবান সিং লরি ভরা চাল পাচার করছে। এবং এই অংকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নাট্যকার পরের অংক/অংশ সাজিয়েছেন : তার শিরোনাম দিয়েছেন ‘বিদ্রোহ’। এই অংকটির বিষয় সত্যবান সিং এর চাল পাচার রোধ করে তার অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নেওয়া এবং তার ফেলে রাখা জিনিসপত্রের হিসাব ঠিক করে লিখে সব বিপ্লবী পরিষদে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। জনযুদ্ধের নীতি হল

১. লড়াইয়ের সময় ছকুম মানা
২. জনতার জিনিস নিজে না নেওয়া
৩. সব মাল বিপ্লবী পরিষদে জমা দেওয়া^{১৮}

রাজনীতির তত্ত্বকে নাটকে রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার দেখাচ্ছেন সত্যবান সিং এবং তার ছেলে জীমূতবাহনের মধ্যে বিবাদ ঘটানো। কারণ এরা শত্রু হলোও ‘কাণ্ডজে বাঘ’। সে কারণে সত্যবান

সিং এবং জীমূতের কথোপকথন হয়েছে অনেকটা লঘু ভঙ্গির

জীমূত ॥ এমন বাপ কেউ দেখেছে? ছেলেকে ফেলে চম্পট দেয়!

সত্যবান ॥ যেতাম না, ডেকে নিতাম।

জীমূত ॥ খচ্চর! কোথায়, কোন চুলোয় উঠবো আমি।^{১৮৯}

কিংবা, জীমূত ॥ যত ক'টা মেয়ে এ গাঁয়ে- সব আমার বাপের জন্য রিজার্ভড! -অথচ ওরা মারবে আমাকেই।^{১৯০}

পালাবার মুখে সত্যবান সিং বিপ্লবী পরিষদের হাতে নাস্তানাবুদ হন। তার সব জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়, অস্ত্র শস্ত্রের দখল ছেড়ে দিতে বলা হয়। তার সংসার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় চাল রেখে বাকিটা পরিষদ দখল করে। এই অংকেও নাট্যকার জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ করে নিয়েছেন। ‘৯’ নম্বর অংকটিতে নাট্যকার প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক এবং রাজনীতিবিদরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত সবাই যে এক মত হয়ে যাচ্ছেন সে কথাই দেখানো হয়েছে।

পুঁজিপতি, জোতদার, কংগ্রেসি, পত্রিকা, উগ্র রংমাখা বাঙালি মহিলা এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী নকশালবাড়িতে প্রজাদের ভোটে নির্বাচিত শিবেন একই স্বরে একই সুরে কথা বলেন। পত্রিকা কথাটির মধ্যে সম্ভবত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

পুঁজিপতি ॥ নকশালবাড়ি অঞ্চলে চীনের গুপ্তচররা ধ্বংস কার্য চালাচ্ছে—

জোতদার ॥ নকশালবাড়ি অঞ্চলে পাকিস্তানের গুপ্তচররা ধ্বংস কার্য চালাচ্ছে—

কংগ্রেসি ॥ নকশালবাড়ি অঞ্চলে চীন ও পাকিস্তানের গুপ্তচররা ধ্বংসকার্য চালাচ্ছে—

পত্রিকা ॥ নকশালবাড়ি অঞ্চলে চীন ও পাকিস্তানের গুপ্তচরদের ব্যাপক ধ্বংসকার্য!

মহিলা ॥ টেরিবল্!

শিবেন ॥ নকশালবাড়ি অঞ্চলে যারা আন্দোলন চালাচ্ছে তারা চীন বা পাকিস্তানের গুপ্তচর নয়।

তারা আমেরিকার গুপ্তচর, সি.আই.এ'র এজেন্ট!

একই ভাবে এরই সমান্তরাল উক্তি আর একটু পরে উঠে আসে।

পুঁজিপতি ॥ নকশালবাড়ির এই আন্দোলনকে দমন করতে না পারলে ভারতের শিল্প ব্যবস্থা বসে যাবে

জোতদার ॥ ...পুরো ভূমি ব্যবস্থা ধ্বংসে যাবে,

কংগ্রেস ॥ ... ভারতের গণতন্ত্র ধ্বংসে যাবে,

পত্রিকা ॥ ... ভারতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিপন্ন হইবে!

মহিলা ।। নকশালবাড়িকে বুটের তলায় পিষে না মারলে সব না খেয়ে মরবো কারণ আমেরিকা
আর সাহায্য পাঠাবে না-

শিবেন ।। নকশালবাড়ি আন্দোলন বন্ধ না করতে পারলে, ভারতের বিপ্লব ধ্বংস হবে, আর
একটা ইন্দোনেশিয়া সৃষ্টি হবে^{১১১}

শুক্লা ওরাওঁ এ সব কথা শুনে গভীর চিন্তায় পড়ে যায়। সে ভেবে পায় না এই আন্দোলনের জন্য
কীভাবে পুঁজিবাদ, জমিদারি প্রথা, গণতন্ত্র, শোষণ ব্যবস্থা, বিপ্লব সব ধ্বংস হবে? আন্তে আন্তে সে
মূল কথাটা বুঝতে পারে। সে ধরতে পারে এদের সকলের কথার একটা অংশ সমান। সবাই চায়
নকশালবাড়ি আন্দোলন দমন করতে। শেষ পর্যন্ত শিবেন বুঝতে পারে এরা সকলে কী চায়।

পুঁজিপতি ।। দমন করো!

মহিলা ।। পিষে মারো!

জোতদার ।। খতম করো!

শিবেন ।। আন্দোলন বন্ধ করো!

কংগ্রেস ।। শেষ করো

পত্রিকা ।। টিপে মারো।

শুক্লা ওরাওঁ বলে ‘ভাষার একটু হেরফের, আর কিছু নয়।’^{১১২} এই ভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর
চিত্র এঁকে নাট্যকার নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি সেদিনকার পুঁজিপতি জোতদার প্রমুখের
রূপটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

নকশালবাড়ি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ইতিহাসে নয় নাটকেও নয়। কিন্তু
নাট্যকার গোটা নাটক জুড়ে কৃষক মজুর ভূমিহীনদের আন্দোলনের কথা যেভাবে বলেছেন, যে
ভাবে তাদের প্রস্তুতি, মার্কসবাদী শিক্ষা এবং আন্দোলন পরিচালনার কথা দেখিয়েছেন তা সেদিনকার
আন্দোলনকারী ও সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। নাট্যকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী
শিবেনের মুখে বলিয়েছেন যুক্তফ্রন্ট সরকার ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলকে নকশালবাড়ি আন্দোলন
দমনের দায়িত্ব দিয়েছেন। কারণ পুলিশ এ নিয়ে কিছু করতে পারেনি। শিবেনের সংলাপে পাই
“এবার সরকার আশা করেন যে... নকশালবাড়ির স্ফুলিঙ্গটা ভারতব্যাপী দাবানলে পরিণত
হওয়ার আগেই নিভে যাবে। ওদের... শেষ করে দিন। শুট টু কিল।”^{১১৩}

পুলিশ মিলিটারি জোতদার রাজনীতিবিদ সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় নকশালবাড়ি
আন্দোলনকে দমন করা হয়। কর্ণেল ত্রিলোক সিং-এর কথায় উঠে এসেছে—“নকশালবাড়ি শুধু
একটা ঘটনা নয়, একটা আইডিয়াও বটে।”^{১১৪} সেই আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়ছে তাও তাঁর

কথায় শোনা যায়—“দেখুন লাল আলো জ্বলছে ২৪ পরগণায় নদীয়ায়, বীরভূমে, পূর্ণিয়ায়।”^{১৬৫} তাই তাকে দ্রুত দমন করতে হবে। কর্ণেলের কথায় “আমেরিকা বনাম চীন— সেই যুদ্ধই চলছে নকশালবাড়িতেও”^{১৬৬} ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ কর্ণেল টেনে এনেছে। সেই যুদ্ধে আমেরিকা যে অস্ত্র ব্যবহার করেছিল এখানে সেই অস্ত্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সোজা চালান এসেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরিণতি আন্দোলনকারীদের পক্ষে যায় নি। পুলিশ মিলিটারির অত্যাচারে আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নকশালবাড়ির আন্দোলনকারীদের সংগ্রামকে নাট্যকার বীরত্ব মণ্ডিত করে দেখিয়েছেন। এই পুলিশ মিলিটারির মিলিত আক্রমণের কাছে যে আন্দোলনকারীদের শক্তি একেবারে নগণ্য হলেও—তারা প্রত্যাঘাত হানতে পারে তারও চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে অন্ধকার রাত্রে পুলিশের গাড়ির আলোয় অন্ধকার কেটে গিয়েছিল, বিদ্রোহীদের ধরতে পেরেছিল পুলিশ। কিন্তু এখানে দেখি হাতিমারা তীর দিয়ে বিদ্রোহীরা সার্চলাইট ভেঙে দিতে পারে। পুলিশের অফিসার সরোজকে তীর বিদ্ধ করতে পারে। জোতদার সত্যবান সিংহ—চর লাগিয়ে বিদ্রোহীদের হৃদিশ এনে দিয়েছিল। তাকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা পচা পাকের ভিতর নামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কর্ণেল ত্রিলোক সিং মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না—যন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করেন। তার শিক্ষক উইলবার জে.মর্টন বলতেন—“মাও হচ্ছেন টিপিক্যাল এশিয়াবাসী মানুষের নৈতিক মনোবলে আস্থাশীল, আর আমেরিকানরা পাশ্চাত্যের মানুষ; বস্তুবাদী যন্ত্রের দাপটে মাও এর স্বপ্নের মানুষকে গুঁড়িয়ে দেব।”^{১৬৭} কিন্তু নাট্যকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের অপরায়েয় পরিণতিতে আস্থাশীল। বিদ্রোহীরা (বাস্তবে নয়) নাটকে তীর মেরে সার্চলাইট গুঁড়িয়ে দেয়, পুলিশ অফিসারকে তীরবিদ্ধ করে এবং কর্ণেলের বাহুতেও তীর এসে লাগে। পুলিশ অফিসার সুন্দর স্বীকার করেছে—“গাদা গাদা যন্ত্র হাতে গুঁজে দিলেই তো হোলো না। যে লোক সে যন্ত্র চালাবে সে শালাই হচ্ছে আসল।”^{১৬৮} নাট্যকার মানুষের শক্তিকে বিশ্বাস করেন। বিদ্রোহীদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন সেই আইডিয়ার কথা। সানঝো ওরাইনের ছেলে মংলুকে যখন পুলিশ জোতদার যন্ত্রণা দেয়, মা সানঝো মংলুকে বলে “বিপ্লবী কাঁদে না কখনো। মুক্তি যোদ্ধা কখনো কাঁদে না মংলু।”^{১৬৯} মংলু মারা যায়। তবু বিপ্লবী শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে না। নকশালবাড়ি আন্দোলনের এই পর্ব পুলিশ মিলিটারির হাতে বিধ্বস্ত হয় ঠিকই কিন্তু তার আলো গোটা ভারতের নানা জায়গায় জ্বলে ওঠে। নাট্যকার সেই আইডিয়ার কথা মনে রেখে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হবার ঘটনা নাটকের শেষে দেখান নি। তবে অত্যাচারী জোতদার সত্যবান সিংকে এরা শাস্তি দিতে পেরেছে। এখানে নাটকের পরিণতি।

নাট্যকার তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে যে মন্তব্যই পরে করুন সেটা তাঁর পরিবর্তিত পরিস্থিতি

ও মানসিকতার জিনিস। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে তিনি নকশালবাড়ি ও সন্নিহিত অঞ্চলের বহু জাতির সহাবস্থান, তাদের দারিদ্র্য, জোতদারের শোষণ, কৃষকদের শোষণ মুক্তির আগ্রহ, মার্কসবাদী শিক্ষা, আন্দোলন ইত্যাদির ছবি যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা সমকালীন রাজনীতির কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার পুঁজিপতিদের রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিবাদ। নাটকে মহাশক্তিমান কর্ণেল ত্রিলোক সিংয়ের হাতে বিপ্লবীদের ছোঁড়া একটি তীর এসে বিদ্ধ হয়েছিল। উৎপল দত্তের 'তীর' নাটক সমকালীন ডানপন্থী-বামপন্থী সব শ্রেণীর রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। নাটকের শিল্পমূল্য কতোটা সে প্রশ্ন এখানে নয়, কতোটা তার কালাতিক্রমী ভূমিকা—তাও নয়—নাট্যকার একটা অস্ত্র খুঁজেছেন, যে অস্ত্র বিপ্লবের আগমনী হিসাবে ভারতের কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা তুলে ধরতে পারে।

টিনের তলোয়ার : বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে সেকালের নটনটীকে প্রণাম জানিয়ে রচিত হয় 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক শ্রেণীর হতমান, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত অথচ প্রভাবশালী নট-নটীর সুখ-দুঃখের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এ নাটকটিতে। যখন বাংলা নাট্যজগতের কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) চালু করতে চলেছে, ঠিক সে সময়েরই এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন নাট্যকার। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর দমন-পীড়ন, অন্যদিকে কোলকাতার বিত্তবান মুৎসুদ্দিদের অনাচার ও ব্যাভিচারের চিত্র এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। নাটকের মধ্যে সেকালের নাট্যশিল্পীদের বেঁচে থাকবার এবং অস্তিত্বের লড়াই যেন উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ সরকারের প্রবর্তিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন যখন বাংলা নাট্য আন্দোলনকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই কোলকাতার একটি নাট্যদল শানিয়ে তোলে তাদের টিনের তলোয়ার। “ যাহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহুরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি।”^{২০০}

'টিনের তলোয়ার' নাটকটির মাধ্যমে উনিশশতকের নাট্য উত্তেজনাকে অনুভব করা যায়। বিভিন্ন নাট্যদলের মধ্যে চাপা ঈর্ষাবোধ, ভাঙ্গা গড়ার খেলা, প্রলোভনের মাধ্যমে অভিনেত্রী নিয়ে যাওয়া, পোস্টার মারা থেকে নাট্যপ্রযোজনার প্রায় সমস্ত কার্যকলাপ নির্দেশকের ওপর বর্তানো, থিয়েটারের বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের কথা এখানে পাওয়া যায়।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হলে মধ্যবিত্ত মানসিকতার নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকরা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশ বিরোধী নাটকের পরিবর্তে এসময়ে পৌরাণিক নাটক লেখার প্রবণতা বেশি দেখা গেল। কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক

থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করল। নাটককে তারা করে তুলল উপার্জনের মাধ্যম। “ ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে ইতিহাসের এই চিহ্নিত সময়কে ধরার চেষ্টা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ নাটকের মধ্যে নাটক নিয়ে এসে দেখালেন সেইসব লড়াকু, প্রতিবাদী, ব্যতিক্রমী নাট্যকর্মীদের যারা নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের রক্ত চক্ষুকে ভূক্ষেপ করেনি।”^{২০১} গতানুগতিক নাটক প্রযোজনা করতে করতে এক সময় তারা বুঝতে পারে যে এসব নাটকে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। থিয়েটারকে প্রাণের গভীর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হলে প্রতিবাদের ভাষাকে এক সময় আয়ত্ত করতেই হবে। আর সে কারণেই হাল্কা রোমান্স ‘ময়ূরবাহন’ কিংবা সামাজিক নাটক ‘সধবার একাদশী’ নয়, তিতুমীরের মতো স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন এক বীরযোদ্ধার কাহিনীকেই বেছে নিলেন তাদের বিদ্রোহী সত্তার সাহস যোগানোর উপাদান হিসেবে। এ নাটকের মাধ্যমে সেই সব বিদ্রোহী সত্তার মানুষগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। — “যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই।”^{২০২}

উনিশ শতকের কোলকাতার মুৎসুদ্দি ধনপতিদের ব্যভিচারের দিকটিও ধরা পড়েছে। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটিতে। সে সময়ের মালিকানাধীন ব্যবসায়ী থিয়েটারের মালিক চরিত্রের ছায়া পড়েছে বীরকৃষ্ণদা চরিত্রে। চটকল, তেলকল, পাটকলের পাশাপাশি থিয়েটারের ব্যবসাও চালান তিনি। তিনি দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার মালিক। শিক্ষা সংস্কৃতি না থাকলেও কেবল অর্থের জোরেই তিনি বঙ্কিমকে কিনতে চান। উনিশ শতকের বাবু সংস্কৃতির প্রতিভূ তিনি। স্ট্যাটাস অনুযায়ী তিনি তিন জন রক্ষিতা রেখেও শাস্ত নন, আরো এক জন রাখতে চান। তার মতো মুনাফা লোভী, বিকৃতরুচি, নারীদেহলোভী লম্পটেরাই-সে সময়ের থিয়েটারের অঙ্গনকে কালিমা লিপ্ত করেছিল।

নাট্যকার দেখিয়েছেন যে কাপ্তেন বেণীমাধবের মতো নাট্যপ্রযোজককেও বীরকৃষ্ণদা-র অধীনেই নাটক করতে হয়। নিজের খুশিমতো নাটক তিনি করতে পারেন না। তাই প্রিয়নাথের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নাটক করার সাহস তাঁর নেই। ‘তিতুমীর’ নাটকের মহলা দিলেও সেটা তাঁকে বন্ধ করতে হয়। নাটক নির্বাচন করতে না পারার যন্ত্রণা, থিয়েটারকে নিজের মতো করে না চালাতে পারার আত্মগ্লানি থেকে তিনি বলেন — “আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়।”^{২০৩} এই স্বীকারোক্তির মধ্যে রয়েছে শিল্পীর অন্তর্দর্হন।

“এই যন্ত্রণার স্বীকার হয়েছিলেন উৎপল দত্ত স্বয়ং। অবশ্য তাঁর পূর্বসূরীরাও এর থেকে রেহাই পাননি। আমৃত্যু থিয়েটারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ গিরিশ ঘোষ,

শিশির কুমার, শম্ভু মিত্ররা জীবনপাত করেছেন একটি মঞ্চের জন্য। যে মঞ্চ হবে স্বাধীন মঞ্চ, যেখানে কারও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। বিনোদিনীরা জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন থিয়েটারকে ভালোবেসে, মঞ্চকে পবিত্র স্থান মনে করে। তাদের আশাও পূরণ হয়নি, সাধ মেটেনি। তাদের সংগ্রাম-সাধনার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এ নাটকের ‘দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা’র অভিনেতা ও পরিচালক বেনীমাধব, অভিনেত্রী বসুন্ধরা, ময়নাদের জীবন সংগ্রাম। তাদের ইতিহাস-বঞ্চনা ও বেদনার ইতিহাস, প্রতিবাদেরও ইতিহাস তাই মহাগৌরবের। গৌরবময় ইতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায়কে উৎপল দত্ত এ নাটকে উন্মোচন করেছেন।”^{২০৪}

এ নাটকের দুটি অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র মেথর ও প্রিয়নাথ। মেথর চরিত্রটি অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি। সে থিয়েটার দেখে না, মাইকেলের নাম জানে না, মাইকেলের কবিতা তার কাছে ‘জঘন্য’ বাবুদের থিয়েটারের চেয়ে তার কাছে ঢের ভালো বাঈজীর খেমটা নাচ, বস্তির রামলীলা। তাই তার সোজা সাপটা কথা “মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পরে, লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা-উজীর সাজো কেন? এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলে মানুষি করো কেন?”^{২০৫} বেণীমাধবের থিয়েটার তার মতে যেন একটা ‘ধাপ্পা’। আসলে ইউরোপীয়ান পোশাক-আশাক পরে মুৎসুদ্দি বেনিয়াদের মনোরঞ্জনের জন্য বাস্তবতা বর্জিত মিথ্যা রাজকীয় কাহিনীর থিয়েটারকে ‘ধাপ্পামারো’ বলার মধ্যদিয়ে ‘টিনের তলোয়ার’ নাটক যেন ইস্পাতের তলোয়ার হয়ে তীব্র আঘাত হানে আমাদের চেতনায়।

মথুরের মতো বাইরের জীবনবোধ বর্জিত মিথ্যে আড়ম্বরকে কষাঘাত করেছে প্রিয়নাথও। সেও বেণীমাধবকে কটাক্ষ করে বলে—“আমি বহুদিন যাবত লক্ষ্য করেছি আপনাদের কদর্য জীবনবোধ বর্জিত নাটকের মিথ্যা আড়ম্বর। বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।”^{২০৬} সমাজের অশিক্ষিত মেথর থেকে উচ্চশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি প্রিয়নাথ উভয়েই বেণীমাধবের ‘ধাপ্পা’টা ধরে ফেলে। বাবু সংস্কৃতির প্রতি মেথর ও প্রিয়নাথ দু’জনেই সোচ্চার হয়েছে দু’রকম ভাবে।

প্রিয়নাথের প্রতিবাদী সত্তা শুধু প্রতিবাদী নাটক লিখেই ক্ষান্ত নয়, সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তাই ভারতবাসীদের ওপর ব্রিটিশের অন্যায়-অত্যাচার দেখে সে রেগে যায় এবং সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় তার মন। তাই রাগে ক্ষোভে সে ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকায় লিখতে চায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিতে চায়। বেণীমাধব যখন তারই সৃষ্টি ময়নাকে বীরকৃষ্ণদাঁ’র কাছে তুলে দিতে বাধ্য হয় তখন প্রিয়নাথ এর

তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সে সরাসরি বেণীর কাছে জানতে চায়—“তাই বলে মেয়েটার সতীত্বকে বাজি রেখে পাশা খেলবেন?”^{২০৭} ময়নাকে নিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখে। তাই ময়নার পরাধীনতাকে সে স্বীকার করে নিতে পারেনি। যে মানুষ জীবনে স্বাধীন নয়, সে মানুষ মৃত-একথাই যেন সে বোঝাতে চেয়েছে ময়নাকে। থিয়েটারের জগতের এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামের দিশা দেখাতে চেয়েছে প্রিয়নাথ।

সবজিওয়ালী ময়নাকে বেণীমাধব নিজের হাতে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শঙ্করীতে রূপান্তরিত করেছেন। অথচ বীরকৃষ্ণের প্রস্তাবে বেণীমাধবের রাজি না হয়ে কিছু করার নেই। নিজের থিয়েটারকে বাঁচাতে, নিজে নাট্যমঞ্চের স্বত্ত্বাধিকারী হবার জন্য, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবন যাপনের রসদকে রক্ষা করবার জন্য তিনি এই অনৈতিক কাজ করতে রাজি হন। অভিনেত্রী বসুন্ধরাও বেণীর একাজের প্রতিবাদ করে, বেণীমাধব নিজেও অন্তর্দাহের আগুনে পুড়ে খাঁক হয়ে গেছেন। থিয়েটারের জন্য তিনি নিজের মেয়েকেও বেঁচে দিতে পারেন বললেও মনের কথাটি একান্তে খুলে বলেন বসুন্ধরাকে—ময়না শুধু তাঁর মেয়ের মতো নয় আরো অনেক কিছু। এ কথাতে বোঝা যায় যে তিনি পরিস্থিতির শিকার এবং অসহায়। বেণীর এ সিদ্ধান্তে ময়নাও অসম্মত হয়। কিন্তু থিয়েটারের স্বার্থে তার স্বপ্নকে সে চেপে রাখে অন্তরের নিভূতে। বেণীমাধব তাঁর সৃষ্টিকে বিক্রি করেও স্বপ্নের থিয়েটার গড়তে পারেনি; আবার বীরকৃষ্ণের রক্ষিতা হয়েও ময়না সুখী হতে পারেনি। অতৃপ্তির একটা অন্তর্বেদনা রয়েই গেল মনে।

“এই অতৃপ্তির বেদনাই মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সেই ক্ষোভ তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। মানুষ খুঁজে পায় প্রতিবাদের ভাষা। তখন সে একা নয়, তার লড়াই একক সংগ্রাম নয়। তখন সে বৃহত্তর মধ্যে নিজেকে দেখতে পায়। বৃহত্তর সংগ্রামের অংশীদার হয়ে উঠে সে। এই নাটকের পরিণতিতেও প্রিয়নাথ, বেণীমাধব, ময়না, বসুন্ধরাদের একক লড়াই, সংগ্রাম প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বৃহত্তর রূপ পেয়েছে। স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা-বেদনা থেকে অতৃপ্তির যন্ত্রণা থেকেই তারা খুঁজে পেয়েছে প্রতিবাদের ভাষা বিদ্রোহের বাণী।”^{২০৮}

আর এই জীবন যন্ত্রণার তলদেশ থেকে উঠে আসা বিক্ষোভ বা বিদ্রোহে অনুঘটকের মতো কাজ করেছে প্রিয়নাথের ‘তিতুমীর’ নাটকটি।

প্রিয়নাথের নাটক একদিন উপেক্ষা করলেও জীবনের অভিজ্ঞতায় বেণীমাধব ‘তিতুমীর’ নাটক করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহড়া বন্ধ হলেও বেণীর অন্তরে যে ছাই চাপা আগুন জ্বলছিল নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই-ই প্রতিবাদ প্রতিরোধের অগ্নিশিখা হয়ে প্রকাশ পেল বেণীর কণ্ঠে তিতুমীরের

বিদ্রোহাত্মক সংলাপে। ল্যান্সার্ট সাহেবের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বেণীমাধব বলে ওঠে—“যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকো পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার, কোষবদ্ধ হবে না কখনো।”^{২০৯} নাটকের টিনের তলোয়ার তখন যেন বিদ্রোহীর সংগ্রামের হাতিয়ার, তার উদ্যত ফলায় প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের তীক্ষ্ণধার। সেই তলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায় নারী ধর্ষকেরা, অত্যাচারীরা। এই তলোয়ারে এসে জমা হয় সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহা, যে প্রতিশোধের আঙনের আঁচে তপ্ত হয়ে উঠে আপামর জনগনের মনের সুপ্ত চেতনা। সাধারণ দর্শকের কাছে এই প্রতিবাদী চেতনাকে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন নাট্যকার এবং তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গণপ্রতিবাদ-প্রতিরোধে পরিণত হয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছে, আর এখানেই ‘টিনের তলোয়ার’ রূপান্তরিত হয়েছে ধারালো প্রতিবাদের তলোয়ারে।

সূর্যশিকার : ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের পটভূমি একশো বছর আগের বাংলা নাট্যশালা, একটি কল্পিত এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতি রচনা করে নাট্যকার সেদিনকার নাট্যশালার টিকে থাকার লড়াই এবং বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে যুগপৎ প্রকাশ করেছেন। আবার ‘সূর্য শিকার’ নাটকের কাহিনীতে তিনি অনেক পিছনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে উৎপল দত্ত তুলে আনেন কিংবদন্তীর কুহকে ঢেকে থাকা প্রকৃত সত্যকে। গুপ্ত যুগের স্বর্ণযুগের জয়জয়কারের পিছনে যে দাস ব্যবস্থার শোষণ অত্যাচারের অনাবিষ্কৃত কাহিনীর অন্ধকার দিকটিও ছিল, তাকে তিনি উদঘাটন করেন। গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষে বস্তুবাদী এক মহা বিজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করেন-বৌদ্ধ শ্রমণ কল্হন তাঁর নাম। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা প্রমাণ করেছে পৃথিবী গোলাকার, চন্দ্র বস্তুমাত্র, কোন দেবতা নয়। কিন্তু শাসক শ্রেণী নিজ স্বার্থরক্ষার্থে কল্হনের এই সত্যকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে; তাঁর গবেষণার কাজকে বন্ধ করার জন্য নানা প্রকার চক্রান্ত চালায়। হাজারও বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এমনকি নিজের অঙ্গহানির বিনিময়েও তিনি গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের সত্যের পথ থেকে এক পাও সরে আসেন নি। বরং নিজের নিষ্ঠায় অনড় থেকেছেন।

কল্হনের শিষ্যা পরিব্রাজিকা ইন্দ্রাণী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় বলেছেন পৃথিবী গোল, এছাড়া তিনি বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে হিন্দু ধর্মের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রাজগুরু বিরূপাক্ষের পরামর্শে রাজা ইন্দ্রানীকে কাষ্ঠচক্রে বন্দী করেন। রাজা সমুদ্রগুপ্ত ইন্দ্রাণীকে কল্হনের চরিত্র কলঙ্কিত করার নির্দেশ দেন। রাজার কথায়—“এই গুরু কল্হনই

আসল বিপদ। সে দেবত্ব, ব্রাহ্মণত্ব সব কিছুই ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে সত্যি কথা বলে। সত্যের আক্রমণে আমরা বিভ্রান্ত সেনাপতি - কিন্তু এ রাষ্ট্রকে তো ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না।”^{১০}

তাই ইন্দ্রাণীর প্রতি রাজার নির্দেশ—“তোমাকে দাঁড়াতে হবে আমাদের সাক্ষী-তুমি কলহনের চরিত্র হনন করবে।”^{১১} ইন্দ্রাণী রাজার আদেশ অস্বীকার করলে রাজা তাঁকে বাধ্য করে রাষ্ট্রের জন্য, ধর্মের জন্য এবং রাজ আদেশের জন্য এ কাজ করতে। এর জবাবে ইন্দ্রাণীর তীব্র প্রতিবাদ—“এ রাষ্ট্রের মস্তকে আমি পদাঘাত করি, আপনাদের জাল ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আমি পদাঘাত করি। রাজাদেশ যদি অমন কদর্য মিথ্যাচারে প্ররোচিত করে তবে রাজাদর্শেও পদাঘাত করি।”^{১২}

ইন্দ্রাণী আরো জানায় যে, আচার্য কলহন তাঁর পিতা বললেও অত্যাচার হয় না, তাঁর নামে অমন মিথ্যা কলঙ্ক তাঁর দ্বারা কোন মতেই সম্ভব নয়। এর ফল স্বরূপ কাষ্ঠচক্রে বন্দী হয়ে ইন্দ্রাণীকে কঠোর শাস্তি পেতে হয় এবং শেষে পাগল হাতির দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়।

সেনাপতি হয়গ্ৰীবকে পাঠানো হয় কলহনের আশ্রমে। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির সম্ভারকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। নিজের চোখের সামনেই নিজের অর্ধশতাব্দীকালের সৃষ্টির সম্ভারকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে কলহনের অন্তরে হাহাকার ধ্বনিত হয়—

“এই ধ্বংসাবশেষ, এই অগ্নিদগ্ধ পুঁজি, এই কাঁচেরগুড়ো এরা সাক্ষী, দানবীয় অজ্ঞানতা প্রমত্ত এই হিন্দু সাম্রাজ্যের পাশবিকতার এই সাক্ষী ডাক দিচ্ছে ভাবীকালকে—অন্ধকারের যুগ ঘুচিয়ে গড়ে তোল আলোকোজ্জ্বল দেশ- যেখানে কুসংস্কারের আক্রোশ পরাহত। যেখানে জ্ঞান কুণ্ঠিত নয়, সত্য যেখানে কারারুদ্ধ নয়, বিজ্ঞানকে যেখানে কাষ্ঠ চক্রে বেঁধে অসহনীয় নির্যাতনে বন্দী করা হয় না।”^{১৩}

শুধু তাই নয়, কলহনের চরিত্রকে কলঙ্কিত করবার জন্য, সমস্ত মানুষের সামনে তাঁকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য মহাশ্বেতা নামক এক গণিকাকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাশ্বেতা কলহনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক দিতে পারেনি। তার আগেই মধুকরিকা নামক এক দাসীর হাতে তার মৃত্যু হয়।

কাষ্ঠচক্রে বন্দিনী ইন্দ্রাণীকে দেখে কলহন অস্থির হয়ে ওঠেন। বারবার করে রাজা সমুদ্রগুপ্তের কাছে প্রাণ ভিক্ষা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। বরং তাঁকে তাঁর সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করতে বলা হয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার এই নির্মমতার বিরুদ্ধে কলহনের প্রতিবাদী সত্ত্বা চিৎকার করে ওঠে—

“আমার কন্যাকে হত্যা করো, সমুদ্রগুপ্ত, কিন্তু যে সত্যের জন্য তার আত্ম বিসর্জন, আমি তার পিতা হয়ে সে সত্যের অবমাননা কেন করব? তাহলে যে ইন্দ্রাণীর মৃত্যু নিশ্চল হয়ে যাবে। না সস্তাট! ইন্দ্রাণীর রক্তের প্রতি ফোটা থেকে যেন জন্ম নেয়

তোমাদের স্বাধিকার প্রমত্ত অজ্ঞানতার সৌধকে চূর্ণ করার বিজ্ঞান, সেটা হবে
আমার একমাত্র ধ্যান।”^{২১৪}

তাই এই অত্যাচারী, সত্যবিরোধী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শবলিকা পল্লীতে ক্রীতদাস গোহিলের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। দাসদের প্রতি রাজতন্ত্রের অমানবিক অত্যাচারের কথা সম্রাটের নিজেরও অজানা ছিলনা। তবু নিজেদের স্বার্থে সত্যটাকে জোর করেই অস্বীকার করেছেন। তাই বন্দী কল্‌হনকে প্রকাশ্য বিচার সভায় নিয়ে এসে বিচারের নামে প্রহসন করেছেন সম্রাট। মহাঋষি কল্‌হনের জিহ্বা কেটে জনতার সামনে পাঠ করেছেন নিজের সাজানো স্বীকারোক্তি, যা কি না কল্‌হন নিজে স্বীকার করেছেন বলে প্রচার করেছেন। কল্‌হন সম্রাটের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করতে চান কিন্তু তা সম্ভব হয় না।

এরও কারণ হিসেবে সম্রাট জানান নিজের ভুল স্বীকার করে কল্‌হন দ্বাদশ বৎসর মৌনব্রত পালন করছেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য। কিন্তু কল্‌হনের কথা বলতে না পারার বিষয়টি দাসী মধুকরিকা ও বিদূষক দর্দূরকে অস্থির করে তোলে। তাই ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সম্রাটের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী সত্ত্বা ধিক্কার জানায়। তার সাথে ঋষি কল্‌হনের সত্যের প্রতিষ্ঠা হবেই বলে আশাবাদী ভাবনার প্রকাশ করে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের প্রয়াসকে ইন্ধন যুগিয়েছে। দাসী মধুকরি ঋষি কল্‌হনকে আশ্বস্ত করেছে—

“না, পিতা, আপনার বিজ্ঞান মরেনি। হতাশার আঁধারে ডুবে যাবেন না; ওদের অজেয় ভেবে আত্মবিসর্জন দেবেন না। আপনার বিজ্ঞান বেঁচে আছে। আমার ছেলে বীরক ইন্দ্রাণীর পুঁথি নিয়ে চলে গেছে দেশান্তরে। আজ হোক কাল হোক, শতবর্ষ-সহস্রবর্ষ পরে হোক পৃথিবী জানবে যে পৃথিবী গোলাকার। তারা জানবে সত্য দ্রষ্টা ঋষি কল্‌হন আর ইন্দ্রাণীর অবিনশ্বর মুখ ঐ সপ্তর্ষি মণ্ডলে, ঐ কালপুরুষ নক্ষত্রে, ঐ ধ্রুব তারায়, ঐ মহাকাশের উদঘাটিত রহস্যে।”^{২১৫}

এ নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন সমকালের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রশাসনের প্রভাবের পরিণতিকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সন্ত্রাস ও নিপীড়নের ফলে বুদ্ধিজীবী বা সত্যান্বেষণকারীগণের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারই জীবন্ত দলিল এই ‘সূর্যশিকার’ নাটকটি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ব্রেখ্টের ‘গ্যালিলিও গ্যালিলেই’ নাটকের ঘটনার সঙ্গে এ নাটকের ঘটনার বেশ খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে। ব্রেখ্টের গ্যালিলিও নিজের জীবন রক্ষার্থে এবং আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে নিজের আবিষ্কারকে ভ্রান্ত বলে ফরমান দেন। কিন্তু গ্যালিলিওর বহু পূর্বে প্রাচীন ভারতের এক নির্ভীক হৃদয় বৌদ্ধ শ্রমণ বিজ্ঞান সাধক কল্‌হন রাষ্ট্রের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সব কিছু

বিসর্জন দিতে সম্মত হননি। এর পাশাপাশি তিনি এও চেষ্টা করে গেছেন যেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সত্য সন্ধানের সংগ্রাম বন্ধ হয়ে না যায়। তিনি দাসদের নিয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রয়াস চালিয়ে গেছেন যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বেঁচে থাকার রসদ হয়ে থাকে। ‘সূর্যশিকার’ উৎপল দত্তের ‘সমুদ্রশাসন’ যাত্রাপালার মঞ্চভাষ্য। ‘সমুদ্রশাসন’ লোকনাট্য পালা অভিনয় করেছিল সূর্যশিকার অভিনীত হল আকাদেমি মঞ্চে ১৩ আগস্ট ১৯৭১ এ। ‘সূর্যশিকার’ নাটকের কাহিনী প্রাচীন ভারতের, তার ভাববস্তু ব্রহ্মাণ্ডের আর নামটি পিটার শ্যাফার এর ‘দি রয়েল হ্যান্ডিং অফ দি সান’ থেকে নেওয়া। নাটকের প্রেক্ষাপট সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের ভারতবর্ষ। সমুদ্রগুপ্ত ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। গুপ্তযুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় সেখানে বর্ণ ব্যবস্থার খুব কড়াকড়ি ছিল। শাসক সম্প্রদায় বর্ণ ব্যবস্থাকে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করতেন। বৈশ্য, শূদ্র এবং নারীরা যে সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই ধারণা প্রচলিত ছিল। গুপ্তযুগে আর্যভট্ট বিজ্ঞান চিন্তায় যুগান্তর এনেছিলেন। তিনি বলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই ধারণা গালিলিও প্রমাণ করেও ইউরোপের সমাজে তা প্রবর্তন করাতে পারেননি। বরং এরকম ধারণা প্রচার করবার ফলে রাজ রোষে পড়েছিলেন। অন্যদিকে আর্যভট্ট এরকম ধারণা প্রমাণ করলেও কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার এই ফল জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। "All these Ideas did not affect the development of much of the later Indian astronomical thought" এবং "the credulous masses continue to believe in the orthodox view".^{২১৬} ইতিহাস থেকে জানা যায় গুপ্তযুগে শূদ্রদের উপর বর্ণব্যবস্থার কড়াকড়ির ফলে এবং আরও নানা পীড়নের কারণে সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতি তাদের আচরণ ছিল বিদ্বেষমূলক। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শূদ্রদের বলা হয়েছে destroyer of the king.^{২১৭} আরও নানা প্রমাণ থেকে ঐ ইতিহাসবিদ মনে করেন গুপ্তযুগে শূদ্রদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল All this as well as passages from the legal texts would suggest a conflict between the shudras and the ruling classes. But references to actual revolts by the shudras against the upper classes are not recorded in the sources of the gupta period.^{২১৮} উৎপল দত্ত তাঁর ‘সূর্যশিকার’ নাটকে ইতিহাসের এই তথ্যগুলিকেই ব্যবহার করেছেন। তিনি যেমন ‘কলহন’কে বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়েছেন তেমনি শূদ্র বিদ্রোহের কথাও নাটকের মধ্যে জানিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানের পক্ষে হিন্দু ধর্মের সমর্থন ছিল না। সমুদ্র গুপ্তকে নাটকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বর্ণব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান সমাজে সংকীর্ণ ছিল। সে কথা নাটকে নানা প্রসঙ্গে এসেছে। ইতিহাসে শূদ্র অসন্তোষের কথা

থাকলেও সত্যিকার বিদ্রোহের কোনো খবর পাওয়া যায় না। উৎপল দত্ত নাটকে অসফল শূদ্র বিদ্রোহের কথা বলেছেন। মোটের উপর নাটকে ইতিহাসের সাধারণ সত্যের বিকৃতি দেখা যায় না—নাট্যকার বরং সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে আকৃতি দিয়েছেন। সে দিক থেকে নাটকে ইতিহাসের তথ্যগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ রচিত হয়েছে। উৎপল দত্তের নাটকে যা দেখা যায়—এক্ষেত্রেও ইতিহাসের অতীতে ঢুকে গিয়ে তিনি মানুষের বিদ্রোহের কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর ইতিহাসবোধও একটি সমাজ চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সে হল অতীত, বর্তমান, দেশ-বিদেশ সর্বত্রই পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহ।

নাটক হিসেবে ‘সূর্যশিকার’ প্রথম থেকেই সেই বিদ্রোহের কাহিনী রচনা করে চলেছে। নারী ও শূদ্রদের সামাজিক সম্মান যে যুগে অত্যন্ত নিচু মানের ছিল সেই যুগে নারী ও শূদ্রদের উপর পীড়নের ঘটনা দিয়েই তিনি গল্প শুরু করেছেন। তাদের নিপীড়নের মধ্যে, বিজ্ঞানচেতনার নিরোধের গল্পের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

ব্যারিকেড : ত্রিশের দশকের জার্মানির ঘটনা ‘ব্যারিকেড’ নাটকটির পটভূমি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানের নাৎসি নেতা হিটলার যখন ষড়যন্ত্র আর হত্যা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা লাভ করে তখন জনসমর্থন পুষ্ট কমিউনিস্টরা কিভাবে হিটলার ও নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এ নাটকটিতে। গণতন্ত্রের নামে সমাজে-রাষ্ট্রে বর্বর ফ্যাসিস্টদের স্বৈরতন্ত্র ও হত্যা-নির্যাতন চলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। আর শ্রমজীবী মানুষেরা ক্রমে শোষিত ও নিপীড়িত হতে হতে শেষে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শ্রেণীসংগ্রামে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ইয়ান পেটার্সন রচিত ১৯৩৩ সালের বার্লিনের রোজনামচা ‘আমাদের রাস্তা’ (উনসেরে স্ট্রাসে) থেকে নাটকটির বিষয়বস্তু গৃহীত হলেও সব দিক থেকে এ নাটক হয়ে উঠেছে সমকালীন পশ্চিমবাংলার এক রক্তাক্ত নাট্যভাষ্য। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান ঘটে। কমিউনিস্টরা এই নির্বাচনকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা দখলকে ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন। প্রখ্যাত জননেতা হেমন্তকুমার বসু হত্যা এবং হত্যার দায় কমিউনিস্টদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, প্রচার মাধ্যমের মিথ্যা প্রচার ও ত্রাস প্রভৃতি রাজনৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। তার পাশাপাশি এ অন্যান্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে।

নাট্যকার জার্মানির পটভূমিকায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রক্তাক্ত হত্যা ও ধ্বংসলীলার চিত্রই উপস্থাপিত করেছেন।

“ততটা তেত্রিশ সালের জার্মানি নয় যতটা বাহানুরের কোলকাতা-পোষা গুণ্ডাবাহিনী
 লেলিয়ে দিয়ে নির্বিচার হত্যা, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ঠাট বজায় রেখে বল প্রয়োগে
 মতপ্রকাশ বা রাষ্ট্রবিরোধিতার অধিকারে হস্তক্ষেপ ও সতত সম্মুখ বহাল রেখে
 রাষ্ট্রশক্তি বা শাসকশ্রেণী যখনই দেশশাসন করে, তখনই ফ্যাশিবাদ মূর্ত হয়।
 ফ্যাশিবাদী প্রবণতার আবির্ভাবেই তার পরিণতির ছবি তুলে ধরতেই ব্যারিকেড
 লেখা হয়।”^{২১৯}

নাটকে দেখা যায় ১৯৩৩ সালে ৩০শে জানুয়ারি হিটলার জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর আসনে
 অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ দিন ধরে নাৎসি বাহিনী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে
 লড়াই চলছে। গত ৬ মাসের মধ্যে ৪৬১টা খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে এবং একমাসের মধ্যে বার্লিনে ৮৩ টি
 রাজনৈতিক খুন হয়েছে।

তিনবছরে পাঁচবার নির্বাচন হয়েছে। বারবার করে কমিউনিস্টরা জয়ী হয় আর আইনসভা
 ভেঙে দিয়ে আবার করে ভোট করা হয়।

১. প্রথম নির্বাচন — ১৯৩০ খ্রীঃ	১৪ ই সেপ্টেম্বর
২. দ্বিতীয় নির্বাচন — ১৯৩২ খ্রীঃ	মার্চ মাস
৩. তৃতীয় নির্বাচন — ১৯৩২ খ্রীঃ	১০ ই এপ্রিল
৪. চতুর্থ নির্বাচন — ১৯৩২ খ্রীঃ	৩১শে জুলাই
৫. পঞ্চম নির্বাচন — ১৯৩২ খ্রীঃ	৬ ই নভেম্বর

আইন সভার মোট আসন সংখ্যা ৬০৮ টি।

নির্বাচনের ফল	নাৎসি	কমিউনিস্ট	অন্যান্য
১. ১ম নির্বাচন	১০৭	৩৫০	—
২. ২য় নির্বাচন	পরাজয়	জয়	—
৩. ৩য় নির্বাচন	পরাজয়	জয়	—
৪. ৪র্থ নির্বাচন	২৩০	২২২	১৫৬
৫. ৫ম নির্বাচন	১৯৬	২২১	১৯১

জার্মানির সর্বাধিক প্রচারিত ‘ফ্রাইয়েৎসাইটুং’ পত্রিকার রিপোর্টার অটোবীর খোলৎস জার্মানের
 পাঁচটি ভোটপর্বের কথা এবং সেসময়ের সামাজিক পরিস্থিতির কথা যেভাবে তথ্যসহকারে বলে
 গেছেন তাতে নাৎসিদের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ শানিত হয়েছে।

কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদক লান্ট নাৎসিদের তাবেদার। তাই সে ছাপাখানার কর্মী স্টাইনকে

পত্রিকার হেডলাইন লিখতে নির্দেশ দেয়—“আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য।”^{২২০} অর্থাৎ লান্টের কথায় হিটলারপত্নী যোসেফৎসাউরিৎস খুন হয়েছেন ভালট্রাসে সড়কের ওপর নিজের বাড়ির সামনে। তিনি ছিলেন সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক। তাঁর খুনী হিসেবে কমিউনিস্টদের দায়ী করা হয়েছে। এই কমিউনিস্টরাই পনের বছর ধরে জার্মানির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ১৯১৮ সাল থেকে এই কমিউনিস্টরাই প্রথম খুনের রাজনীতি আনল। লান্টের এসব কথায় কিন্তু অটো অসম্বস্ত হন। কেননা এসব কথায় পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। লান্ট কলমের জোরে সব কিছু জানিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে চাপা দেওয়া হচ্ছে জেনে অটো অশ্বস্তি প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও কৌশলে অটোকে অসত্যকে সত্য করতে বাধ্য করেন সম্পাদক লান্ট।

য়োসেফৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে কমিউনিস্ট নেতা ছটিগকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ছটিগের বিচার করেন আলবের্ট ফস।

অটোর কথা অনুযায়ী কমিউনিস্টরা দোষী এ কথা একশ ভাগ সত্য নয়। অটো সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ভালট্রাসে নামক স্থানে যান, যেখানে কমিউনিস্টদের শক্তি বেশি এবং তিন তিনটি সঠিক প্রমাণের দ্বারা ছটিগকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।

ছটিগ জামিন পেলেও নিরাপত্তা আইনে তাকে বন্দী করা হয়। ছটিগকে সহযোগিতা করার সন্দেহেৎসাউরিৎসের পালিত পুত্র শাল পাউলকেও বন্দী করা হয়।ৎসাউরিৎসের স্ত্রী ইংগেবর প্রথমে কমিউনিস্টদের দোষারোপ করলেও পরে নাৎসিদের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। ইংগেবর নাৎসিদের ঘৃণ্য কৃতিত্বের কথা যখন প্রমাণ সাপেক্ষে বুঝতে পারলেন তখনই তার মানস চক্ষু খুলে যায়। তাই তিনি বলেন—“একটু খানি সাহস, ডাক্তার স্ট্রুবেল, দরকার একটু খানি সাহস। একটু খানি মেরুদণ্ড সোজা করে চোখে চোখ রেখে কথা বলা। একটু সাহস যে একটি স্ফুলিঙ্গ, জানেন? আগুন ধরাতে পারে।”^{২২১}

পালিত পুত্র শাল পাউলকে যখন নাৎসি নেতা লিপার্ট গুলি করে হত্যা করে তখন নাৎসিদের প্রতি ইংগেবরের তীব্র খিঙ্কার বর্ষিত হয়—“তোমরা বিকৃত মস্তিষ্ক। তোমরা সভ্যতার শেষ। তোমরা আবার যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করছো।”^{২২২}

এরপর ইংগেবর উপস্থিত হয় ভালট্রাসের ব্যারিকেডে। ন্যাৎসিদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন তিনি। মোহভঙ্গের পর এখন তার ধারণা- নাৎসিরা ঘরের ছেলেগুলোকে রাস্তায় টেনে বের করে মেরে ফেলছে, এর প্রতিকার হিসেবে পিস্তল ধরা দরকার। ব্যারিকেডের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন এবং কারণ হিসেবে বলেন—“অনেক

কিছু দেখে বুঝলাম, হাঁটু গেড়ে বাঁচার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরা ভাল। ... এখন বুঝেছি, আগে মরে কমিউনিস্টরা, তারপর একে একে আসে অন্যদের পালা, তারপর—তারপর একদিন দেখি গোটা দেশটাই একটা জেলখানা।”^{২২৩}

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে ছটিগকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করলে বিচারপতি ফস বিচার বিভাগের অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর নাৎসিদের এ নিরাজ্জ হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নাৎসিরা নিজেদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ছটিগকে বিপদজনক আখ্যা দিচ্ছে—একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না বিচারপতি ফসের। ক্ষুব্ধ বিচারপতি নাৎসি নেতা লিপার্টের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে ক্ষোভ বর্ষণ করেন—“আপনি একটা জালিয়াত। ক্যাপ্টেন হেস মিথ্যাবাদী। এই পুরো মামলাটা সাজানো হয়েছিল নির্বাচনী চাল হিসেবে। আমার এ-ও ধারণা জন্মাচ্ছে, ওসারিৎসকে খুন করেছিল হয় শাদা-পোশাকে পুলিশ আর নয় তো আপনার নাৎসি গুণ্ডার দল।”^{২২৪} ফসের এ জ্বালাময়ী কটাক্ষে নাৎসিদের মুখোশ খুলে যায়। সাহসী এই বিচারপতিকে আততায়ীর দ্বারা হত্যা করা হয়।

এরপর আইনসভা রাইখস্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে তার দায় কমিউনিস্টদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। হিটলার পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব নিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকারকে হরণ করেন। গণতন্ত্রের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও সমাধিস্থ করেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একতরফা ছইপ জারি করেন—

১. কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করা হল।
২. ঐ পার্টি সদস্যদের দেখা মাত্রই গুলি করে মারার নির্দেশ জারি হল।
৩. সর্বপ্রকার কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ হল।
৪. সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়।

এরপর চলে এলাকা ঘিরে ঘিরে নির্বিচারে কমিউনিস্ট হত্যা, এমনকি, মেয়ে, শিশু, বৃদ্ধরাও বাদ পড়েনি। সেই সঙ্গে চলে পুস্তক দহনের মতো ঘৃণ্য অপসংস্কৃতি। মার্কস, এঙ্গেলস, টমাসমান, এরিখ মারিয়া রোমার্কে, হাইনরিশ হাইল প্রমুখ বিখ্যাত সব লেখকদের বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখান ডাক্তার স্ট্রুবেল।

এছাড়া নাটকের গোড়ায় দেখা যায় সূত্রধার যে সবাক কার্টুন দিয়ে মূল নাটকটি শুরু করেন সেই কার্টুন সম্পর্কে উৎপল দত্তের মন্তব্য—

“ব্যারিকেড নাটকের কাহিনীটাই হচ্ছে কতগুলো লোকের কার্টুন থেকে মানুষ

হওয়া—তাই নাটকের গোড়ায় কার্টুন; এ কার্টুন তাৎপর্যময়, নিছক কোনো চটক নয়। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমশ প্রাণ পাচ্ছে, জেগে উঠেছে, নিজেকে জানছে, সমাজকে জানছে। লান্ট জানছে সে প্রতারণিত, লিপার্ট জানছে সে আসলে স্নায়ু হীন উন্মাদ মাত্র; স্ট্রুবেল, অটো, ইংগেরা জানছে কোন দিকে তাদের স্থান।”^{২২৫}

এভাবেই প্রতিটি চরিত্র তাদের নিজের নিজের স্থান বেছে নেয়। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে একত্রিত হয়। শ্রেণীচেতনায় এই শ্রমজীবী মানুষেরা রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক পরিসীমার বদলে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ হতে চায়। তাই শ্রমিকদের কোন নির্দিষ্ট দেশ থাকতে পারেনা সমগ্র পৃথিবীটাই তাদের দেশ। আর সে জন্যই বোধ হয় বিপ্লবের গানে দেশী-বিদেশীর সীমারেখা নেই।

নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন করে আবার ওসারিৎস হত্যা মামলা চালু করা হয় এবং মামলার প্রধান সাক্ষী হিসেবে ইংগেবর, ড. স্ট্রুবেল, সাংবাদিক অটোকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। এদের সামনেই নাৎসি নেতা লিপার্ট শাল পাউলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর পরেই দেখা যায় আক্রান্ত ও রক্তাক্ত দেহে কমিউনিস্ট কর্মীরা ভাল্ট্রাসের ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে নাৎসি ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে যুদ্ধ করে চলেছে। আর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ যারা গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ। ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তাই বৃদ্ধা ইংগেবরের দৃপ্ত ঘোষণা—“আমি এখন এও বিশ্বাস করি -বন্দুকের গুলি দিয়েই হবে শেষ ফয়সালা। বন্দুকের নলে আগুন হেনে যা বলার আছে সব বলতে হবে। আর কোনো ভাষা ওরা বুঝবে না।”^{২২৬}

নাট্যকার কমিউনিস্টদের এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের মূল আদর্শ মানবতাকে নীতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার উৎপল দত্ত ইয়ান পেটার্সনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে নাটকটির অন্তর্গত ভাবনাকে উন্মোচন করেছেন—

“ফ্যাশিবাদ কী? কীভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাশিস্তরা ঝোড়ো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে ফেলে দেশের আকাশ? ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহস্থ বধু, ধর্মযাজক, সাংবাদিক সর্বপ্রকারের বুদ্ধি জীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারে না? ফ্যাশিবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে? জার্মেনিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বলে শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে সবাইকে যদি না বড় বেশি দেরী হয়ে যায়।”^{২২৭}

এ অন্তর্গত ভাবনায় একদিন চেতনা ফিরে পান ইংগেবর এবং তার মতো অনেকে। তাই সকলে ভাল্ট্রাসের ব্যারিকেডে হাজির হয়েছে, মুক্তির লড়াইয়ে গুলিবর্ষণ করেছে, বন্দুক তুলে

নিয়েছে হতে। লড়তে থাকে জীবন বাজি রেখে উর্দে তুলে ধরে ছিন্ন লালনিশান। “আর ভোর বাতাসে যুদ্ধ জীর্ণ লাল নিশান উড়ছে তাদের প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর হয়ে।”^{২২৮} সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ইংগেবরের মৃদু স্বরে একান্ত আবেদন— ‘জাগো জাগো সর্বহারা’।

উৎপল দত্তের বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ ‘ব্যারিকেড’ নাটকটি পড়লে সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই স্মরণ করায়।

“এ নাটক রূপকের আড়ালে ভারতীয় স্বৈরতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করেছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমাজ বদলের ত্রুদ্ব আহ্বান উৎপল দত্তের নাট্যরচনার মূল প্রেরণা। কারণ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ লড়াই-সংগ্রামের পথ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এপথে উত্তরণ লক্ষ্যে বারবার বিরুদ্ধ শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সত্তরের দশকে এ লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে এবং প্রতিমুহুর্তে জরুরী হয়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম। আর সেই শ্রেণীসংগ্রামের প্রেরণাকে আরো বেশি তীব্র আকারে উপস্থাপন করেছেন ‘ব্যারিকেড’ নাটকে উৎপল দত্ত।”^{২২৯}

মিডিয়ার মিথ্যা প্রচার ও ত্রাস যেখানে মায়া জাল ছড়ায় সেখানেই সৃষ্টি হয় ফ্যাসিবাদের দুর্গ। তাকে ভেদ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সে সত্যকে অনুসরণ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বৈপ্লবিক রোমান্টিকতাই অটো, ইংগেবর চরিত্রগুলির মতপরিবর্তনে মূর্ত হয়ে ওঠে। বাস্তবের ভিত্তির ওপর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বা কল্পনার সৌধ তৈরী করে যেন সেই সম্ভাবনাকেই বাস্তব করে তোলার প্রয়াস দেখিয়েছেন উৎপল দত্ত তাঁর ‘ব্যারিকেড’ নাটকে।

দুঃস্বপ্নের নগরী : সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বিভীষিকাময় কোলকাতা শহরের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটকটি। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিল কোলকাতা শহর। সে সময়ে রাষ্ট্র নেতারা এ শহরের নাম দিয়েছেন কখনো ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ কখনো বা ‘মিছিলের নগরী’ কারণ এই নগরী শাসক দলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে।

স্বৈরাচারী শাসকদল সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্ত দেশ জুড়ে বিস্তার করেছিল এক নতুন ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন। অস্বচ্ছ প্রশাসন, কালোবাজারী ব্যবসায়ী, বিত্তবান মজুতদারের দল সকলেই মিলিত ভাবে কৌশলে বামপন্থী নেতা কর্মীদের দমন করার ব্রতে নির্মম হয়ে ওঠেন। ফলে সমগ্র কোলকাতা শহর জুড়ে সৃষ্টি হয় এক নৈরাজ্যের পরিবেশ।

কোলকাতার প্রগতি পন্থী, প্রতিবাদী সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মী, নাট্যকার ও নাট্যকর্মীগণ আক্রান্ত হয়েছিলেন। যাদবপুর, কাশীপুর, বারাসাত, বেলেঘাটায় গনহত্যা চলেছিল। বিভিন্ন থানা

ও জেলের ভেতর চলেছিল নির্যাতনের মাধ্যমে নির্বিচারে হত্যা লীলা। অসীমা পোদ্দারের মতন মহিলারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। প্রখ্যাত জননেতা হেমন্ত বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এ সমস্ত নারকীয় তাণ্ডব কোলকাতা বাসীকে সে সময় আতঙ্কিত জীবন-যাপনে বাধ্য করেছিল। পাড়ায় পাড়ায় তল্লাসী করে বামপন্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ফলে অনেক বামপন্থী নেতা কর্মী বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। আসলে সত্তরের দশকের গোড়ার দিক অস্থির ও ভয়ঙ্কর সময়ের দর্পণ।

নাট্যঘটনার শুরুতে দেখা যায় নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ব্যবসায়ী ও কালোবাজারী মজুতদার লক্ষ্মণ পালিত শাসক দলের যুবনেতা চিন্ময় গোস্বামী, পুলিশ অফিসার মৃগাঙ্ক রায় ও পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দ চাটুয্যেকে ডেকে তার চালের গুদাম লুণ্ঠের খবর দেন। এই লুণ্ঠনের দায় চাপিয়েছেন বামপন্থী কর্মী স্বপন ও মুস্তফা-র দলের লোকেদের ওপর। তিনি আরও জানান যে, স্বপন ও মুস্তফার লোকেরা প্রচার করছে - লক্ষ্মণ পালিতের সঙ্গে আরো ছয় জন মন্ত্রী এবং স্থানীয় শাসকদলের নেতারাও চোরাকারবারে লিপ্ত।

লক্ষ্মণ পালিতের মতো কালোবাজারী মজুতদাররা পুলিশ প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় করে বেকার ছেলেদের কে দিয়ে নোংরা কাজ করায়। অল্প সংস্থানের আশায় ক্ষুধাতুর এই বেকারদের দল নিজেদের অজান্তে এসে ধরা দেয় কালোবাজারীদের ফাঁদে। তারপর একটা অপরাধ থেকে মুক্ত হতে বাধ্য হয় আর একটা অপরাধ করতে। এভাবেই তারা ব্যবহৃত হতে থাকে। পরিণতিতে তারা কিছুই পায় না। শুধু আত্মীয় পরিজনদের কাছে, দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে পরতে হয় এবং মজুতদারদের কথা মতো কাজ না করলে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অকালে মরতে হয়। এরকমই এক ষড়যন্ত্রের শিকার মণিভূষণ, সে লক্ষ্মণ পালিতের ভাড়াটে খুনী।

মণিভূষণ চরিত্রটির মাধ্যমে নাট্যকার তৎকালীন শাসক দলের রাজনৈতিক চরিত্রকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। বি.এ. পাস ফণিভূষণ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয়ে একদিন ব্যাংক ডাকাতি করে এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর চলে অমানবিক পুলিশি নির্যাতন। একদিন তার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে কমিউনিস্ট হত্যার হুকুম দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে এ কাজ করতে পারলে তাকে ডাকাতির দায় থেকে রেহাই দেওয়া হবে। তখন তার শুভ চিন্তার শক্তিও লোভ পায়। হত্যা করে একটা ছেলেকে। এরপর এই অপরাধ থেকে বাঁচবার জন্য তাকে তৃতীয়বার হত্যা করতে হয়। এভাবেই চলে খুন আর খুন এবং শাসকগোষ্ঠী তাকে ভয়ঙ্কর খুনী করে তোলে। এখন সে তাদের হাতের পুতুল মাত্র। কিন্তু তার ভেতরেও ফিরে আসে সঙ্ঘিত। নিজের কাজকর্মের জন্য সে অনুশোচনা করেছে। “ভুল হয়ে গেছে বড়! ভুল দিকে

গুলি চালিয়েছি। পিস্তল নিয়ে নিজের ভাইকে মেরেছি! ঐ মজুতদার আর মালিকের দল আমাদের দিয়ে জঘন্যতম কাজগুলো করিয়ে মানুষকে শোষণ করে! তারপর ওরা আমাদেরই হত্যা করবে এক এক করে করবেই, কোন সাক্ষী ওরা রাখবেনা।”^{২০০}

লক্ষ্মণ পালিতের একান্ত সচিব পূর্ণিমা বসুকে গ্রেপ্তার করা হয় সংবাদ পাচারের দায়ে। মেইন্টেনান্স অফ ইন্টার্নাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী পূর্ণিমাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অফিসার মৃগাঙ্ক রায় লক্ষ্মণ পালিতের দপ্তরে এনে বসায়। বিগত যৌবন লক্ষ্মণ পালিত পূর্ণিমাকে অশ্লীল কটাক্ষ করলে পূর্ণিমা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পায়ের জুতো দিয়ে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ পালিতকে। “ছোটলোক কথাকার! এক জুতোর বাড়িতে দাঁত কটা ফেলে দেব!”^{২০১} জিজ্ঞাসাবাদের নামে পূর্ণিমার ওপর চলে দৈহিক নির্যাতন। নিভীক পূর্ণিমা পুলিশ অফিসারকেও জুতো দিয়ে গালে আঘাত করে। যুবনেতা চিন্ময় পূর্ণিমাকে শুধু তথ্য পাচারকারীই নয় উগ্র বামপন্থী বলেও মন্তব্য করে। পুলিশ অফিসার টান মেরে মাটিতে ফেলে দেয়, সিপাহীরা বন্দুক দিয়ে চেপে ধরে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করে। তবু পূর্ণিমা মাথা নত করে না বরং বেশি করে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে—“সার্টেনলি নট। উঠতে পারলে তোমায় জুতো পেটা করতাম! তিন-তিনটে জোয়ান মর্দ মিলে একটা মেয়েকে মারছে!”^{২০২}

আবার পূর্ণিমাকে যখন পুলিশ ভ্যানে করে লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন পূর্ণিমার প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘোষিত হয়—“পুলিশ দিয়ে মেয়েদের ঘর থেকে বের করে আনছ! ধর্ষণ করাচ্ছ! ফল ভালো হবে না! এক দিনে বছর যায় না। ফল ভালো হবে না। মার শুরু হলে আর পালাবার পথ পাবে না।”^{২০৩}

পূর্ণিমার প্রেমিক মণিভূষণ। পূর্ণিমার গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের জন্য মণিভূষণ ভীষণভাবে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। পুলিশ কর্তা মৃগাঙ্ক এবং যুবনেতা চিন্ময়কে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। মণিভূষণের দ্বারা। মৃগাঙ্ক ও চিন্ময় কৌশলের আশ্রয় নিয়ে জানায় যে, কমিউনিস্ট কর্মী স্বপনকে যদি মণিভূষণ হত্যা করে তবেই পূর্ণিমা সতীত্ব নিয়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু অশান্ত মণিভূষণ ঘৃণা ও থুথু সহকারে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ত্রুদ্ব হয়ে বলেছে—“পূর্ণিমাকে আজকের মধ্যে ছেড়ে না দিলে আমি সব ফাঁস করে দেব। কি করে একটা মজুতদারের ঘুষ খেয়েছে এই নেতা, এই পুলিশ কনস্টেবলকে কে খুন করেছে- দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে কে মেরেছে-অন্ধ পল্লবকে কি করে পুলিশের সামনে খুন করা হয়েছে সব বলতে শুরু করব মহাশয় গণ।”^{২০৪}

মণিভূষণ এখানেই ক্ষান্ত হননি কোলকাতাকে যে এই বাবুরাই দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করেছেন তা বলতেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।

“শালা আজ বিকেলের মধ্যে যদি পূর্ণিমা বাড়ি না ফেরে তবে কেলেঙ্কারী ফাঁস হবে। এবং সে কেলেঙ্কারী আরো বহুদূর গোড়াবে, বাবুরা! এটা ফাঁস হলেই লোকে হেমন্ত বসুর খুনের ব্যাপারটা বুঝবে, জর্জ আর উপাচার্য খুন হবার রহস্যটা ধরে ফেলবে। আরো ডজন ডজন হত্যাকাণ্ডের নায়করা ধরা পড়ে যাবেন। কোলকাতাকে যে আপনাই দুঃস্বপ্নের নগরী করে তুলে নকশাল আর সি.পি.এম কে নন্দ ঘোষ বানিয়ে শেষ করে দিতে চাইছিলেন, এসব লোকেরা বুঝে ফেলবে।”^{২৩৫}

শোষণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা লক্ষ্মণ পালিতের মতো বিত্তবান শ্রেণীর এবং শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা পুলিশ কর্মীদের নগ্নরূপকে এভাবে কৌশলে জনসম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকার।

লক্ষ্মণ পালিতের মতো ধনবান পুঁজিপতিরা শাসক দলের কাছে নমস্য। এদের অর্থেই চলে দল, লালিত হয় নেতৃত্বন্দ, পরিচালিত হয় পত্রিকা। এদের কাছে জাতিপ্রেম, দেশপ্রেমের কোন অর্থ নেই। লক্ষ্মণ পালিতের অবাধ শোষণ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে যুবনেতা চিন্ময় একটু আপত্তি জানালে লক্ষ্মণ পালিতের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হয় এদেরই স্বার্থে। এদের স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা চূত্ব হয়েছিল। লক্ষ্মণ পালিত তার কাঙ্ক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন—

“পরোধীন পশ্চিমবঙ্গ কাঁচামাল জুগিয়ে যাবে ভারত যেমন জোগাত ব্রিটেনকে। তাই যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করেছি, কাঁচামাল আবার বাইরে পাঠাচ্ছি। এবং শুনে হয়তো সুখী হবেন, পশ্চিমবঙ্গকে এখন মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে এগার নম্বরে নামিয়েছি। আরো নামাব। ভারতের সর্বনিম্ন স্থানে তাকে নামিয়ে তবে আমাদের ছুটি।”^{২৩৬}

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি লক্ষ্মণ পালিতের এসব কথায় পাঠক ও দর্শকদের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এরপর যা হওয়া উচিত তা হল জনতার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের বিস্ফোরণ।

মণিভূষণকে দিয়ে যখন স্বপনকে হত্যা সম্ভব হল না তখন মণিভূষণকে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অপর দিকে চিন্ময় ও লক্ষ্মণ পালিতের দল স্বপন হত্যার জন্য গিরীন নামক এক ভারতে খুনীকে নিয়োগ করে। গিরীন তার শিষ্য পিকলুকে নিয়ে স্বপনদের আড্ডাখানা কৃষ্ণচূড়ার চায়ের দোকানে যায়। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের জন্য স্বপন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গিরীনকে বেশি পরিমাণে নেশা খাওয়ালে বেসামাল হয়ে পড়ে এবং নেশা কাটলে কৃষ্ণচূড়ার কৌশল জানতে পারে। সে কৃষ্ণচূড়াকে প্রহার করতে থাকে। দোকানের মালিক জনকের

অনুরোধেও কোন ফল হয় না। গিরীন কৃষ্ণকে নিয়ে যাবে বিবি বাগানের গলিতে, সেখানে গলা কেটে তাকে হত্যা করবে। এমন সময় হাতে লোহার রড নিয়ে স্বপন, মোস্তাফা ও কয়েকজন শ্রমিক উপস্থিত হয় দরজায়। গিরীন চমকে উঠে, গর্জে ওঠে স্বপন—“অনেক সহ্য করেছি এবার মজদুরের মোকাবিলা করতে হবে তোদের।”^{২৩৭} গিরীন পিস্তল বের করলে শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর চলে জনতার প্রহার।

স্বপন কৃষ্ণচূড়া জানার আঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করতেই নির্মম প্রহারে জর্জরিত কৃষ্ণচূড়ার কণ্ঠে ব্যক্ত হয় দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া—

“না, কিছু হয় নি। আর মুষ্টি ভিক্ষার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা নয়, আর দু’মুঠো চালের জন্য হাত পাতা নয়, আর আকাশ ছোঁয়া দামের দিকে তাকিয়ে কপালে করাঘাত নয়। মজুতদারের ঘুষ খেয়েছে যারা তাদের উপড়ে ফেলতে হবে এদেশের মাটি থেকে। খেতে চাইলে পুলিশ, সি.আর.পি আর গুণ্ডা লেলিয়ে দেয় যারা তাদের ধ্বংস করতে হবে। মা-বোনের ক্ষুধার কান্নায় আর কোন সান্ত্বনা নেই।”^{২৩৮}

অর্থাৎ নিপীড়িত মানুষ প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের অধিকারকে চিনতে পেরেছে। এবং নিজের অধিকারকে কি উপায়ে পেতে হয় সে পথেই এগিয়ে ছলেছে।

উৎপল দত্ত সত্তর-বাহাত্তর সালের পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রায় প্রতিটি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ও ঘটনাবলীকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপে কিংবা বিভিন্ন কৌশলে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকটির বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক রাজদ্রোহের মামলাও হয়েছিল ১২৪ (ক) ধারায়। তবু অভিনয় থেমে থাকেনি। গোপনে প্রচার করে অভিনয় হয়েছে, তবু টিকিটের জন্য হাহাকার। উদ্যোক্তারা স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সমস্ত পাড়া সতর্ক প্রহরায় ঘিরে রাখতেন। সঙ্গীতে, কবিতায়, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে, কৌতুক আর প্রতিবাদী চেতনার জাগরণে ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটকটি সেকালে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছিল কোলকাতা বাসীর মধ্যে। আসলে—“এ নাটকের মধ্যদিয়ে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে কংগ্রেসী অত্যাচার ও হত্যার রাজত্বকে। নাট্যকার অসামান্য দক্ষতায় ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ ও মুখোশ উন্মোচন করে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।”^{২৩৯}

মহাবিদ্রোহ : পরাধীন ভারতে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী দেশবাসীর এটাই ছিল প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার বিপর্যয়ের পর একশ বছরের ইংরেজ শাসন শোষণ ও নির্যাতনের চরম পরিণতি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। বর্বর ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ভারতবর্ষের বুকে এক ধ্বংসাত্মক অভিযান চালিয়েছিল-নির্মম নিপীড়নের মধ্য দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি এবং দেশীয় দালাল মজদুরেরা মিলে কিভাবে দেশ ও দেশবাসীকে শোষণ করে চলেছে তারই নগ্নরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে নাট্যঘটনার মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে শোষণ ক্লিষ্ট দেশবাসীর ক্ষোভ একটু একটু করে সঞ্চিত হতে হতে তা একদিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে মহাবিদ্রোহ রূপে।

“এই নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমগ্র জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। বিদ্রোহের মহিমাকে অনুধাবন করাতে এবং সমকালের সংগ্রামী মানুষকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন তিনি। ইতিহাস বিস্মৃত জাতি বলে অভিযুক্ত বাঙালিকে ইতিহাসের গৌরবময় সংগ্রামের কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। চেতনার উন্মেষ ঘটানোর দায়বদ্ধতা নিয়েই।”^{২৪০}

এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ দাঁতে কেটে ভরতে হবে। আর এই কার্তুজ বা টোটাতে থাকে শুয়োর ও গোরুর চর্বি মেশানো, যা মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের সিপাহীদের ধর্মীয় সংস্কারে বাঁধে। এ ঘটনাটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং সমগ্রদেশ জুড়ে এক প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সে সময়ে।

নাট্যঘটনায় দেখা যায় এক তাঁতি পরিবারের মা ও পুত্র প্রতিশোধের আশুপন বুক নিয়ে এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানোর প্রসঙ্গটি সিপাহীদের সামনে তুলে ধরে। ফলে দেখা যায় ইংরেজ পুষ্ট ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে একটা বিস্ফোভ দানা বাঁধে। এরপর বেরিলি থেকে আসা এক ফকিরের কথাবার্তা অনুযায়ী সিপাহীরা ইংরেজ বিদেষী হয়ে ওঠে এবং প্রতিকার চায় তারা।

এ তাঁতি পরিবারটি তৎকালীন ভারতের সমস্ত তাঁতি তথা সাধারণ শ্রমিক পরিবারের প্রতিনিধি। পরিবারের কর্তা বুধন জোলা ও তার পুত্র বিষেন জোলাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ফ্রেজার ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে কম দামে কাপড় বিক্রি করতে মানা করে। দেশী প্রযুক্তিতে তৈরি কাপড় যে দামে বুধন বিক্রি করে সে দামে বিদেশী কাপড় বিক্রি করলে লোকসান হয়। কেননা ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় শিল্পকে নস্যৎ করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বিদেশী শিল্পের বাজারকে। কিন্তু বুধন জোলা এ আদেশ মানতে অস্বীকার করে। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা তাদের দু’জনকেই গ্রেপ্তার করে এবং বুধন জোলার হাতের আঙ্গুল কেটে দেয়। বিষেন জোলা কোন ক্রমে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পায়।

এ নির্মম দৃশ্যের প্রত্যক্ষ দর্শী বিষেণের স্ত্রী কাস্তুরী তার শিশুপুত্র কালুকে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ঘটনাচক্রে এই বিষেণ জোলা ও কালুই পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হিরা সিংহ

ও লছমন সিং নাম ধারণ করে এবং ইংরেজ অধীনস্থ বেঙ্গল আর্মিতে সৈনিক হিসেবে কাজ করে। সৈনিক জীবনের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী হিরা সিং রিসালদার ও লছমন সিং সওয়ার হিসেবে পদ লাভ করে। কিন্তু পিতা ও পুত্র একে অপরকে চেনেনা। হিরা সিং এর নেতৃত্বেই সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি এলাকায় এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহী সৈনিকেরা ইংরেজদের হটিয়ে দিল্লী পর্যন্ত দখল করে নেয়। ইংরেজদের হাতে গৃহবন্দী বাদশা বাহাদুরশাহ-র স্বার্থপর দেশদ্রোহী ভজীর-এ-আজম আসানুল্লা ও বানিয়া মহাজন তুলারামের ষড়যন্ত্রে হিরা সিংকে ফাঁসিতে প্রাণ দিতে হয়। স্ত্রী কাস্তুরীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে সেই অস্তিম লগ্নেই পিতার সঙ্গে পুত্র লছমনের পরিচয় হয়। সিপাহীরা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে পরাজিত হয়। ব্যর্থ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যা ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ নামে ইতিহাস খ্যাত।

হিরা সিং এর চরিত্রের মাধ্যমে বিপ্লবী আদর্শ ও জলন্ত দেশপ্রেমকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা বারে বারে ভারতবাসীর উপর নির্বিচারে অত্যাচার, নির্যাতন চালায়। এমন এক নির্মম নির্যাতনের কথা জানা যায় লছমন সিং এর কথায়—
“... একদিন দেখেছিলাম আমাদের কাপ্তান মেরিভিলের তাঁবুর সামনে একটা মেয়ের দেহ পড়ে আছে। উলঙ্গ, পেটে সঙিন বেঁধানো।”^{২৪১}

নাটকটিতে আরো দেখা যায় যে তাঁতিদের তাঁত বন্ধ করে শাসক গোষ্ঠী কৃষিপ্রধান সব শিল্প ধ্বংস করে দেয়। তাঁতিরা অনাহারে মারা যায়। তাদের অনেককে অন্যায়াভাবে হত্যাও করা হয়। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন কাপড় তৈরির কারিগরদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। আমিন পাঞ্জাকুশের উক্তি থেকে জানা যায়—“তাঁতিদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় দেড় লাখ লোক থাকত এখন ত্রিশ হাজারও নয়। শহরতলিতে বাঘ ডাকছে শুনেছি। শ্মশান হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গিরা এদেশ থেকেই তুলো নিয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ মন, তারপর ফিরিঙ্গিদের স্থানে কাপড় তৈরী করে আমাদের কাছেই এনে বেচছে।”^{২৪২} সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ও বানিয়ারা এভাবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে দিনের পর দিন। সাধারণ মানুষ এসব অন্যায়ে প্রতীবাদ-প্রতিরোধও করেছে বারে বারে। কিন্তু সে প্রতীবাদকে নির্মম ভাবে রক্তক্ষয়ী পদ্ধতিতে প্রতিহত করেছে ইংরেজরা।

সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে স্বাধীনতার লড়াইয়ে। এ বিদ্রোহের মধ্যে রয়েছে একটা আদর্শ, একটা স্বপ্ন। সিপাহীরা যে শুধু লড়াইয়ের রক্তমাখা রংটাই দেখেছে এমন নয় বরং তার চেয়েও বড় করে দেখেছে ‘স্বাধীনতা’ বিষয়টিকে। তাই শুধু রক্তের নেশায় উন্মাদ ফিরিঙ্গিদের মতো নিম্ন মানসিকতার প্রকাশ নেই তাদের মধ্যে। তাই লছমন সিং যখন বলে—“ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়।

শত্রু হচ্ছে এই আমির আর এই বাণিয়ার দল। আমাদের উচিৎ বন্দুক ঘুরিয়ে ধরা। ওদের গলা কাটা, ওদের মুণ্ডু নিয়ে পোলো খেলা।”^{২৪০} লছমনের এ কথায় তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্বাধীনতার সৈনিক হিরা সিং। লছমনের জামার কলার চেপে ধরে বলে—

“তুমি একটা রক্ত পিপাসু হিংস্র জানোয়ার। গলা কাটা আর মুণ্ডুকাটার জন্য এ লড়াই নয়। মারতে বাধ্য হলে আমরা নিশ্চই মারব, কিন্তু রক্তপাত নিয়ে গর্ব করে ফিরিস্টি ফৌজ, ওটা হিন্দুস্থানের গরীবদের খাতে নেই, আমরা লড়াই একটা আদর্শ নিয়ে, একটা স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নকে তুমি নিছক রক্তের হোলি খেলায় টেনে নামিয়ে আনছ। তোমার কোন বিশ্বাস নেই, দেশের প্রতি টান নেই, এ মাটিতে মিশে থাকা মহত্ত্বের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। স্বাধীনতার লড়াইয়ে তুমি শুধু লড়াইটা দেখ স্বাধীনতাটা দেখতে পাওনা।”^{২৪১}

বাণিয়ারা ধনীরা সিপাহীদের মৃত্যুকে নিয়ে ব্যবসা পেতেছে। বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না কাস্তুরী বাঈয়ের। ফিরিস্টিদের থেকেও দেশের বড় শত্রু দেশের এই অসৎ ব্যবসায়ীরা, মজুতদাররা।

সিপাহীদেরকে দু’দিকে লড়াই করতে হয়েছে দু’দিক থেকে - একদিকে গোড়া ইংরেজ অন্যদিকে আমীর বাণিয়ার দল অর্থাৎ মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। হিরা সিং ওরফে বিয়েন সিংকে চক্রান্ত করে ফাঁসিতে ঝালায় এই আমীরেরই দল। অথচ সিপাহীরা আসল রহস্য বুঝতেই পারছে না। তাই কাস্তুরী বলে—“দুটো লড়াই চলছে আমাদের সঙ্গে গোড়ার আর আমাদের সঙ্গে আমীরদের। সেটা না বুঝলে কিছুই বুঝলে না। তোমাদের সামনে শত্রু, পিছনেও শত্রু। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে মরছ আর পিছন থেকে চশমখোর আমীর আর বাণিয়ার দল ছুড়ি চালাচ্ছে।”^{২৪২}

বন্দী সম্রাট বাহাদুর শাহের জীবনে নতুন আলো এনে দিতে পেরেছিলেন সৈনিক হিরা সিং। সম্রাট বাহাদুর শাহ যখন বন্ধ ঘরের জানালার পাশে গিয়ে দেশবাসীর জয়ধ্বনি শুনতে পান তখন তরবারি নেড়ে তাদের প্রত্যাভিবাদন জানান। মনে শক্তি সঞ্চার করেন—“এবার মির্জা গালিব সাহেবকে আসতেই হবে। এবার আমি সূর্যের তেজে জ্বলে উঠেছি। আলমগীরের শক্তি আমার বাজুতে।”^{২৪৩} এরপর সম্মিলিত জনতার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার—“জানুপাতো! শপথ নাও- স্বাধীনতা ও ধর্মের শত্রু ইংলিশিয়াকে হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত না করে তলোয়ার কোষবদ্ধ করব না।”^{২৪৪}

“উৎপল দত্তের সমাজবীক্ষণ এ নাটকে প্রকৃত ইতিহাস উদঘাটন করেছে।”^{২৪৫} অগ্রাসী ব্রিটিশ শক্তি ও দেশীয় পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে সাধারণ দেশবাসীর প্রতিবাদী চেতনার জাগরণ

ঘটানোর ক্ষেত্রে এনাটক যথার্থ সহায়ক হয়েছে; যা সমকালের প্রেক্ষাপটে বিচার্য।

এবার রাজার পালা : প্রাক স্বাধীনতা পর্বে ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তিম লগ্নে ১৯৪৬ সালে উত্তরবঙ্গের কল্পিত এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের পটভূমিতে, 'এবার রাজার পালা'র আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার মেচগীর রাজ্যকে তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। রূপকের আবরণে স্বৈরতন্ত্রী এক নায়কের উত্থান-পতন এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন হল এ নাটকের মুখ্য বিষয়। নাটকটিতে রাজনৈতিক স্যাটায়ারে নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা হয়েছে।

নাট্যকাহিনীর শুরুতেই দেখা যায় ননী অধিকারীর পালা গানের দলের বন্ধু নিয়মিত রাজার অভিনয় করে। যাত্রাদলটি দশ বছর যাবৎ সারাবাংলায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পালা অভিনয় করেছে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশিকতার প্রচার চালিয়ে গেছে।

উত্তরবঙ্গের স্বাধীন মেচগীর রাজ্যের এক গ্রামে কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহের আমন্ত্রণে একবার পালা গাইতে এসেছে ননী অধিকারীর দল। জমিদার ত্রিদিবের গোয়াল ঘরে বসে তারা 'কংস বধ' পালার মহড়া দিচ্ছে। দু'দিন বাদে জমিদার ত্রিদিবের সৌজন্যে পালাগান হবে। এই ত্রিদিব আসলে মেচগীরের রাজা টিকেন্দ্রজিত সিংহের খুড়তুতো ছোট ভাই।

মার্কসবাদী নেতা ভীষ্মলোচন দাস কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহের মহল্লায় 'কেলে স্ট্যালিন' নামে অভিহিত। কয়েকদিন আগেই সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ত্রিদিবের আক্রমণে পড়েছে। ত্রিদিব ভীষ্মকে হত্যা করবার জন্য তেড়ে আসায়, সে দৌড়ে এসে বন্ধুদের কস্টিউমের মধ্যে আশ্রয় নেয়। অবশ্য এতে পালা অভিনেতাদের বিশেষ করে বন্ধুর সমর্থন ছিল। কিন্তু ত্রিদিব সেখানে গিয়েও তল্লাসি চালায়। সে সূত্রেই নজর পড়ে বন্ধুর প্রেমিকা যমুনার দিকে। ত্রিদিব যমুনাকে প্রলোভন দেখায়। তাকে ভোগ করার চেষ্টা করে। অর্থের লোভে যমুনাও রাজি হয়ে যায়। ঠিক এমন সময়েই মেচগীর রাজ্যের দেওয়ান হরকিশোর রায়, মন্ত্রী দোলগোবিন্দ, ব্রিগ্রেডিয়ার বরাহ বর্মণ এসে জানায় যে, পোলো খেলার সময় তাদের রাজা ঘোড়া ভেবে বুনো ষাঁড়ের পিঠে উঠতে যায় এবং ষাঁড়ের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অবর্তমানে সারা হিন্দুস্থানে মহারাজার আটত্রিশ জন জারজ সন্তানদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে এই বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বন্ধুকে প্রমাণ সাপেক্ষে রাজা ঘোষণা করেন। কেননা রাজার কোন বৈধ সন্তান ছিল না। "মহারাজ বঙ্গেশ্বর সিংহ মন্ত্রীপরিষদ আপনাকে মেচগীর রাজ্যের একমাত্র ও সার্বভৌম অধীশ্বর ঘোষণা করেছে।"^{২৪৯}

বন্ধুর এই পাদোন্নতিতে ত্রিদিব ক্ষোভে ফেটে পড়লে দেওয়ান তাকে নিয়মের কথা

জানায়। বন্ধু সারাজীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে যাত্রা দলে রাজার অভিনয় করে এসেছে। এতদিন সে সবাইকে বলে এসেছে যে তার শরীরে রয়েছে মেচগীর রাজের রক্ত। তার মা ছিল ঐ রাজার উপপত্নী। কিন্তু কেউ তার কথায় আমল দেয় নি। আজ সে প্রমাণ সাপেক্ষে মেচগীরের রাজা। তাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে বন্ধু ননী অধিকারীকে বলে—“চলো ননী দা এবার রাজার পালা, সত্যিকারের রাজার পালায় গান গেয়ে আসি।”^{২৫০} কিন্তু নাট্যকাহিনীর ক্রমবিস্তারে দেখা যায় যাত্রার নকল কংস রাজা ধীরে ধীরে প্রকৃত কংস রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মেচগীরের রাজা হয়ে বন্ধু জমিদারী প্রথা ভেঙে দিয়ে প্রজাপরিষদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রজাদের সামনে বাহাত্তর দফা প্রতিশ্রুতি দেয়। নাট্যকার প্রথম থেকেই বন্ধু চরিত্রের মধ্যে স্বৈরাচারী মানসিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই পোড়াতে দেখে কৃষক নেতা ভীষ্মলোচন দাস যাকে হিটলারের প্রেতাঙ্গা বলে উল্লেখ করেছে। হিটলারের এই প্রেতাঙ্গাটিই প্রকৃত রাজা হয়ে ক্রমে অত্যাচার, নির্যাতনের মাধ্যমে জার্মানীর স্বৈরশাসক হিটলারের স্বৈরতন্ত্রকে হার মানায়। তবে কৃষক নেতা ভীষ্মলোচনের নেতৃত্বে শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধেরও মুখোমুখি হতে হয় বন্ধুকে প্রতিমুহূর্তেই।

বন্ধু নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাজা বলে ঘোষণা করে। যদিও ‘সমাজতান্ত্রিক রাজা’ কথাটি তার একদম পছন্দ নয়। ‘মেচগীরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েম কর’ নেহেরুর এই উক্তি প্রসঙ্গে বন্ধু বলে—“নেহেরু কী জানেন সমাজতন্ত্রের। আমি দেখাব সমাজতন্ত্র কী? ... এ-দেশ জমিদারের নয়, পুঁজিপতির নয়, এদেশ আপনাদের। তাই আজ থেকে মেচগীর রাজ্যে জমিদারী প্রথা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল।”^{২৫১} বন্ধুর এ বক্তব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয় হিটলারের প্রতিধ্বনি। হিটলারও তার বক্তৃতায় জার্মানিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলত। হিটলারের মতো বন্ধুও দেশে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

বন্ধু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে, পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীর বোনাস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গণতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেয় বন্ধু—“গণতন্ত্র মানে আমি যা বলব সবাই মিলে তাই করবে। সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র।”^{২৫২} অর্থাৎ গণতন্ত্রের নামে প্রকৃত অর্থে স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম করতে চায় বন্ধু। রাজ্যের সংবিধান তার নিজের সুবিধা মতো সংশোধন করে নিতে চায়।

স্বৈরশাসক বন্ধু ধীরে ধীরে নানা রকমের প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। অরণ্য শ্রমিক ইউনিয়ন বোনাস বন্ধের প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে। নেতৃত্ব দেয় ওদের নেতা ভীষ্মলোচন ও ওসমান। বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বন্ধুর একান্ত সহচর নাপিত ঝগুড় সেনা অধিনায়ক বরাহ বর্মণকে বিদ্রোহ দমনের

পরামর্শ দিলে চন্দ্রশেখর ডোম এতে আপত্তি জানায়। “না, না, আমরা সব চাষীর ছেলে, চাষীদের নয়ণের মণি ভীষ্ম আর ওসমানকে ধরতে সৈন্য পাঠাব?”^{২৬০}

চন্দ্রশেখর ডোমের এ কথায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষ শ্রেণীচেতনায় ভীষ্মলোচনদের সহমর্মী হয়ে উঠেছে। বন্ধু কৌশলে ভীষ্মলোচন ও ওসমানকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। ফলে ভণ্ডামীর মুখোশ ঢাকা তার ভয়ঙ্কর স্বৈরতন্ত্রী হিটলারি চেহারা বাইরে বেড়িয়ে আসে। তার বিশ্বস্ত সহচরদের আর তাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। ক্রমশ দেখা যায় পুরোনো পরিষদের পাশাপাশি বন্ধুর বিশ্বস্ত পরিষদ যাত্রাদলের সহকর্মীগণও তার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চলে যেতে চাইছে।

বন্ধু শুধু প্রশাসনের দিক থেকেই নয়, হাবে ভাবে, চুল গোঁফের কায়দাতেও হিটলারের রূপ ধারণ করে। জঙ্গলের শ্রমিক ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেনা অধিনায়ককে নির্দেশ দেয় জঙ্গলের বিদ্রোহী শ্রমিকদের নিশিচহ্ন করে দিতে এবং ধরা মাত্রই গুলির নির্দেশও দেয়। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বন্ধুর সিদ্ধান্ত “আজ থেকে আদালত থাকবে, কিন্তু তার কোন ক্ষমতা থাকবে না। ... আমরা যা করব তার বিরুদ্ধে কড়ে আঙুলটি তুললে জজের জেল হবে।”^{২৬৪} এভাবেই বন্ধু স্বৈরশাসনের এক স্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

গোপনে যমুনার মাধ্যমে অরণ্য যুদ্ধের খসড়া ভীষ্মের কাছে পাঠায় ননী অধিকারী। ফলে শ্রমিক নেতা ভীষ্মের দল রাজার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। পরাজিত হবার পরে মহারাজ বন্ধু ক্রোধে উন্মাদ হয়ে সেনা অধিনায়ক বরাহ বর্মণকে ভীষ্মদাসের স্ত্রী আন্না কালীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসে নির্যাতন করার নির্দেশ দেয়। সকাল-সন্ধ্যা কার্ফু জারি করে রাজ্যজুড়ে বিভীষিকার পরিবেশ তৈরী করে, টাউন হলের মাঠে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে গুলি চালিয়ে অন্তত দশটি লাশ ফেলে দেওয়ার হুকুম দেয় পুলিশকে। এরকম দিশেহারা পরিস্থিতিতে বন্ধু তার রাজ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে যখন ব্রিটিশদের স্মরণাপন্ন হয় তখনই চামারিয়ার সঙ্গে বন্ধুর তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়।

মেচগীর রাজ্যের ব্যাঙ্ক মালিক ও বেণীয়া কিশোরীলাল চামারিয়া অর্থের বিনিময়ে নতুন রাজা বন্ধুকে বশে রাখতে চায়। রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল ইতিমধ্যে সে কিনে ফেলেছে। বিশাল বনাঞ্চল কিনে একদিকে যেমন সে কাঠের ব্যবসা চালাচ্ছে আবার অন্যদিকে আরো কিছু জায়গা ইজারা নিয়ে লোহার খনি বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা এলে লোহার খনি তো দেবেই না উপরন্তু তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে। চামারিয়া বেশ ভালো ভাবেই জানে যে সম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শোষণের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হবে।

সেজন্যই চামরিয়া ব্রিটিশ বিরোধী।

“নাট্যকার এই বেনিয়া চরিত্রটির মধ্যদিয়ে ক্ষয়িশুঃ সামন্তবাদী সমাজের ভেতর থেকে সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী চরিত্রের উত্থান দেখিয়েছেন। এই পুঁজিপতিদের অর্থ দিয়েই রাজা বাদশাদের মসনদের চাকচিক্য যেমন বেড়েছে তেমনি ভোগবিলাসিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এরা রাজ্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে এবং নেপথ্য থেকে রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে।”^{২৫৫}

এই চামরিয়া অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বন্ধুকে সম্মত করে ইসলাম পুর মহল্লা ইজারা দিতে। কিন্তু মেচগীরের মন্ত্রীপরিষদ ও সামন্তবাদী শাসক শ্রেণী চামরিয়ার এ ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে নি। এরা চামরিয়াকে আর বাড়তে দিতে রাজি নয়। কিন্তু চামরিয়া একেরপর এক চক্রান্ত চালিয়ে যায় নিজের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে।

বন্ধুর যাত্রা দলের সংগীত শিল্পী চন্দ্রশেখর ডোম নাটকে একজন প্রতিবাদী সত্তা। বেতার কেন্দ্র উদ্বোধনী উপলক্ষে শিল্পী চন্দ্রশেখর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। দাশরথি রায়ের বিপ্লবাত্মক গান।

“যেমন পাপ ঘুচিলে পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত।

দুর্জন ঘুচিলে গ্রাম পবিত্র, দস্যু ঘুচিলে পথ।।

..... ..

জঙ্গল ঘুচিলে স্থান পবিত্র, বেণী ঘুচিলে কেশ।

অত্যাচারীর রাজ ঘুচিলে পবিত্র স্বদেশ।।”^{২৫৬}

এরকম তীব্র প্রতিবাদী সংগীত স্বেশ্ব শাসকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ত্রুঙ্ক বন্ধু গান বন্ধ করতে বলে। শুধু তাই নয় বন্ধুর বলির খড়্গ নেমে আসে চন্দ্রশেখরের ঘাড়ে। বন্ধুর আদেশে ঘাতক বডুয়া চন্দ্রশেখরকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চন্দ্রশেখর গান গেয়ে যায়। “নাট্যকার এই শিল্পী হত্যার ঘটনাটির মধ্য দিয়ে সুনিপুন ভাবে এক ভয়ঙ্কর সুন্দর নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি করবার পাশাপাশি একটি প্রচণ্ড প্রতিবাদী চেতনারও জাগরণ ঘটিয়েছেন।”^{২৫৭}

এই শিল্পী হত্যার ভেতর দিয়েই নাট্যকার নাট্যঘটনাকে চূড়ান্ত পরিণতি প্রদান করেছেন। কমিউনিস্ট কর্মী ভীষ্ম ও ওসমানের বিদ্রোহী মজদুর বাহিনী যখন স্বেশ্ব শাসনের ওপর চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত তখন মন্ত্রী দোলগোবিন্দ ও চামরিয়া জঙ্গলের মধ্যে আসে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু ভীষ্ম চামরিয়ার এ ফাঁদে পা দেয় না। সে বুঝেছে এটা চামরিয়ার রাজনৈতিক চাল।

তাই দোলগোবিন্দকে হুশিয়ারি দিয়ে ভীষ্ম বলে—“অস্ত্রের জোরে আজ পর্যন্ত সাত হাজার নারী পুরুষকে খুন করতে পারেন আর আমরা অস্ত্র ছুঁলেই চোখ কপালে ওঠে? অস্ত্র ছাড়া আপনাদের অস্ত্রকে রুখব কিসে?”^{২৫৮}

ভীষ্মের কথামতো ননী অধিকারী হিটলারের বেশ ধারণ করে বন্ধু সেজে তারই পরিষদদের কৌশলে ব্যবহার করে মেচগীরে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করেছে; বন্ধুর যুদ্ধের প্ল্যান ওলট পালট করে দিয়েছে। ননী ফোনের তার ছিন্ন করেছে। এমন সময় বন্ধু প্রবেশ করলে ননী আয়নার পিছনে লুকায় এবং কাঁচ সরিয়ে বন্ধুর প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নেশাগ্রস্থ বন্ধু হিটলার রূপী ননীকে তাঁর প্রতিবিম্ব ভেবে হাত বাড়ালে ননী করমর্দন করে। বন্ধু চিৎকার করে মেঝেতে পড়ে যায়। এসময়ে আয়না থেকে বেড়িয়ে এসে ননী বলে—“আমি তোমার ছায়া নই। তুমি আমার ছায়া। আমি আসল আডল্‌ফ হিটলার। তুমি আমার প্রতিবিম্ব। আমার সুনিপুণ অনুকরণ।”^{২৫৯} হিটলার রূপী ননী আরো জানায়—“তোমার জীবন সুতোয় ঝুলছে।.... আমরা ভাবি আমরাই বুঝি আসল ভাগ্যবিধাতা। আসলে আমরাও পুতুল। আমার সুতো ছিল ক্রপ, টিসেন, ফার্বেন প্রভৃতি মহাধনীদের হাতে। তোমার সুতোও বাঁধা রয়েছে বানিয়া জমিদারদের হাতে।”^{২৬০}

এ কথাগুলি শোনার পরেই বন্ধুর চৈতন্য জাগে। আর সে কারণেই চিৎকার করে বরাহ বর্মণকে ডাকে কিন্তু বর্মণরা ততক্ষণে প্রভূবদল করে ফেলে। তাই মুহূর্তেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হয় হিটলারের প্রেতাত্মা স্বৈরশাসক মহারাজ বন্ধুকে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হাতে প্রবেশ করে ত্রিদিব সহ অন্যান্য পারিষদেরা। ত্রিদিবকে দেখে রহস্য বুঝতে পারে মুমূর্ষু বন্ধু। এসময়ে চামারিয়া বলে—“হামি তুলিয়ে লিলম। হাপনি ব্রিটিশকে বুলালেন— তাই তুলিয়ে লিলম। ইনি ব্রিটিশকে বুলাবেন না। আমার টাকাতেই রাজাগিরি করবেন, অথচ আমার কথা শুনবেন না?”^{২৬১} ত্রিদিব সিংহকে পুনরায় রাজা ঘোষণা করা হয় এবং বন্ধু হত্যার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় ভীষ্মের ওপর। অথচ চামারিয়ার ষড়যন্ত্রেই এই প্রাসাদ বিদ্রোহ সংঘটিত হল। চিরকালের শোষিত নির্যাতিত সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষ ভীষ্ম ও ওসমানদের আবার ফিরে যেতে হয় শোষণ বঞ্চনার জায়গাতেই।

দাঁড়াও পথিকবর : বাংলার নবজাগরণের গর্ভজাত ‘ভোরের পাখি’ মাইকেল মধুসূদনের এক প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী মূর্তি গড়েন নাট্যকার উৎপল দত্ত ‘দাঁড়াও পথিকবর’ নাটকটিতে। নাটকটি একটা ভণ্ড স্থানু, ক্লীব সমাজের বিরুদ্ধে মধুসূদনের জেহাদ। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলচাষীদের অভ্যুত্থানের সময়ে নবজাগরণের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল।

নাট্যকার উৎপল দত্ত মধুসূদনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে। উনবিংশ শতকের এই প্রথিতযশা প্রতিভা মাইকেলের মধ্য দিয়ে নাট্যকার একটা গোটা যুগের অস্থিরতা, কালচেতনা, স্বদেশিকতার উন্মেষ এক কথায় সামগ্রিক রূপরেখার দ্বান্দ্বিক চরিত্রটিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। “নাট্যকার দেখিয়েছেন মাইকেল এক বিদ্রোহী কবি ও নাট্যকার। তিনি শুধু মাত্র ভাব ভাষা ছন্দ বা চরিত্র নির্মাণে প্রথা বিরোধী নয়, রাষ্ট্র বিপ্লব, সমাজ পরিবর্তনের চিত্রও তিনি অভিনব ভাবে এঁকেছেন তাঁর রচনায়।”^{২৩২} নাটকটিতে একদিকে রয়েছে মাইকেলের ব্যক্তি জীবনের সংকট ও যন্ত্রণা, প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ এক উদ্দাম প্রতিভার বিস্ফোরণ অন্যদিকে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্ভর কোলকাতা কেন্দ্রিক আলোক প্রাপ্তির মধ্যে নবজাগরণের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও মূল্যায়ন।

স্ট্যালিন-৩৪ : ১৯৩৪ সালে রাশিয়ার পটভূমিতে রচিত হয় ‘স্ট্যালিন-৩৪’ নাটকটি। বিপ্লবকে সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ রক্ত ঝড়ে তার থেকেও বেশি রক্ত ঝড়াতে হয় সে বিপ্লবকে ধরে রাখতে। নাটকে এ বিষয়টিকেই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ, দেশের ভেতরের প্রতিক্রিয়াশীলদের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ, ক্ষমতা লিপ্সু আমলাদের ষড়যন্ত্র, এমনকি স্ট্যালিনকে হত্যা করবার পরিকল্পনা—দেশের এরকম পরিস্থিতিতে লেনিনের যোগ্য উত্তরসূরী স্ট্যালিন বাধ্য হয়েই কঠোর হয়েছিলেন দেশের শাস্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য। সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই স্ট্যালিন দেশি-বিদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লালফৌজের কঠোরতা, ক্ষমতা বেশি পরিমাণে প্রদান করেছিলেন।

লালফৌজের উৎপীড়নের জন্য স্ট্যালিনকে সমালোচিতও হতে হয়েছিল। কিন্তু উৎপল দত্ত তাঁর যুক্তি দিয়ে স্ট্যালিনের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করেছেন এবং এ বিষয়ে দর্শক বা পাঠককে তাঁর মতাদর্শের জায়গাটুকু চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

১৯৩৪ সালের রাশিয়ার এ বিষয়টিকে তিনি তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। যখন এ নাটকটির অভিনয় চলে তখন

“পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন সি.পি.আই (এম) এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু কংগ্রেসী চক্রান্ত অতীতের মতোই সক্রিয়। এমনি অবস্থায় মার্কসবাদী নাট্যকার উৎপল দত্ত লৌহমানব স্ট্যালিন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ হয়ে দেশের ভেতরকার সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের ভয়ানক চক্রান্ত, এমনকি দলের ভেতরকার নানান ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ

করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নির্মাণের ইম্পাত কঠিন দৃঢ়তার বিষয়টিকে
নাটকের উপজীব্য করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ও জনগণকে সতর্ক-সজাগ
ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন।”^{২৬৩}

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতাদর্শের আলোকে সমাজতন্ত্র নির্মাণে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী
ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেতনা বিকাশে ‘স্ট্যালিন-৩৪’ নাটকটি বলিষ্ঠ
ভূমিকা পালন করে যা তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

লেনিন কোথায়? : রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত এই নাটকটির বিষয় মার্কসবাদ।
নাটকের কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যবর্তী
সময়ের ঘটনা। বলশেভিকদের নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন হয়। কিন্তু কেরেনস্কির নেতৃত্বে
দেশের ক্ষমতা দখল করে মেনশেভিকরা। ফলে মেনশেভিকদের সঙ্গে বলশেভিকদের সংঘাত
শুরু হয় যা পরবর্তীতে লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের আকার ধারণ করে। মেনশেভিক
প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি লেনিনকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিভিন্ন কৌশল করে কিন্তু লেনিন আত্মরক্ষার
জন্য আত্মগোপন করে। আত্মগোপনে থাকাকালীন সময়েও লেনিন তার শত্রুদের নানা প্রকার
কুৎসা, চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং অনেক বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতাকে মোকাবিলা
করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। “লেনিন, স্ট্যালিন, ত্রুপস্কায়া,
কেরেনস্কি সহ বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবের নেতাদের ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে নাট্যকার
সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসী সন্ত্রাসের অন্ধকার বীভৎস দীনগুলিতে প্রাণিত হতে
চেয়েছেন।”^{২৬৪}

তিতুমীর : ‘তিতুমীর’ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে তিতুমীর। তাঁর আসল নাম মীর নিসার
আলি। তিতুমীরের নেতৃত্বে ১৮৩০-এর বাংলায় জমিদার ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একটি
বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলিম চাষীদের স্বার্থরক্ষায় তিতুমীর এই আন্দোলন সংগঠিত
করেছিলেন। তিনি শুরুতে ইসলামের শুদ্ধতা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল
“ইসলামে পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন করা, হজরত মহম্মদের নির্দেশ পালন করা, হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে
একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার দমন করা।”^{২৬৫} উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে
ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল মুসলমান সমাজে সেই আন্দোলনের দুটি রূপ লক্ষ করা যায়।
একটি ‘ফরাজী’ অন্যটি ‘ওয়াহাবি’ আন্দোলন। আদতে ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপে শুরু
হলেও ক্রমশ এগুলি গ্রামের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হিন্দু-মুসলমান কৃষকশ্রেণীর পক্ষে তাদের
স্বার্থরক্ষার কাজ করেছিল। সুপ্রকাশ রায় তাঁর ‘ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’ গ্রন্থে

হান্টারের মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবি আন্দোলন কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল।^{২৬৭} এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াহাবি যোদ্ধা পক্ষের অ্যাডভোকেট অ্যানিস্ট সাহেব আদালতে একে ‘ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ’^{২৬৭} বলেছিলেন। সুপ্রকাশ রায় এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে লিখেছেন তিতুমীর প্রমুখ ওয়াহাবি বিদ্রোহের নায়কেরাই সর্বপ্রথম সচেতন ভাবে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ করে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলেছিলেন।^{২৬৮} উৎপল দত্ত এই নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত না করে তিতুমীরের বিদ্রোহের তাৎপর্যকে নাটকে রূপায়িত করেছেন। নাটকের শুরুতে তিনি তিতুমীরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভূমিকা অংশে লিখেছেন—“তিতুমীর সম্পর্কে ক্রমশ অধিক গবেষণা হচ্ছে এবং প্রতি বছরই আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিছু কিছু বাড়ছে, এটাই আশার কথা। এখন আর পাতার পর পাতা প্রমাণ দাখিল করে তিতু যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষকদের নেতা ছিলেন একথা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হয় না।”^{২৬৯} নাটকের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন— ১৮৩০ - এ বাংলার গ্রামেগঞ্জে বলসে উঠেছিল হিন্দু মুসলিম চাষীদের তরবারি মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের নেতৃত্বে। আজকের সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত ভারতবর্ষে তাই তিতুমীরকে পূর্ণমূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছে এ নাটক।^{২৭০} তিতুমীরের বিরুদ্ধে সেকালে হিন্দু বিদ্বেষী সুন্নি মুসলমান বিরোধী ও মুসলিম বিরোধী নানা অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ইতিহাস গবেষণায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাই ‘আবার তিতুমীর’ কে মঞ্চে এনে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। সাম্প্রদায়িক সংহতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ একই সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় এবং জমিদারের সংলাপের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাদের নির্মম শোষণের চিত্র, আর তিতুমীরের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলিম প্রজাবিদ্রোহের ইঙ্গিত। তিতুমীর যে দেশীয় জমিদার ও ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ত্রাসের কারণ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কোম্পানীর এজেন্ট ক্রফোর্ড পাইরনের উক্তিতে। বাণ্ডুগির নিমক পোক্তানে পাইরনের বাড়িতে আলোচনা, আড্ডার মাঝে পাইরন জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের উদ্দেশ্যে বলেন—“আমি একটা মুখ দেখেছি। আজ থেকে তিন বছর আগে নারকেলবেরিয়ায়। ঘর্মান্ত সে মুখ প্রতিজ্ঞায় হিংস্র। ... তার নাম মীর নিশার আলি.... চেনেন না? আপনার প্রজা। দেখছেন? আপনি বুঝছেন না কী বিপদ, বুক টান করে দাঁড়িয়েছে আপনার অতি নিকটে।”^{২৭১}

পাইরনের কথাগুলিকে আমল দিতে না চাইলে এবং তিতুকে মামুলি বলে অবজ্ঞা করায় কৃষ্ণদেব রায়কে পাইরন আরো বলেন—

“এই দ্বিতীয়বার আপনি তিতুমীরকে মূর্খ বললেন যাতে প্রমাণ হয় আপনি তিতু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রাজা সাহেব, তিতুমীর যখন মুসলিম চাষীকে দাড়ি রাখতে বলে বা আরবি নামটা সজোরে আমাদের মুখে ছুঁড়ে মারতে বলে, তখন সে আসলে, সেই চাষীকে পৃথিবীর বুকে দু’পা দৃঢ় ভাবে রেখে মাথাটা উদ্ধতভাবে সোজা করতে শেখাচ্ছে। এটা আপনি বুঝতে পারছেন না।”^{২৭২}

তিতুমীরকে কৃষকদের রায় গুরুত্ব দিতে না চাইলেও পাইরন তথা ইংরেজের পক্ষে তিতুমীর গুরুত্বহীন নয়। তাঁর ক্রিয়াকলাপ ইংরেজদের পক্ষে মোটেও সুবিধাজনক নয়। তাই তিতুমীরকে নিয়ে পাইরন সাহেবের অস্বস্তির শেষ নেই। শ্রেণী বৈষম্য, মানসিকতার গণ্ডি থেকে মানুষকে মুক্ত আলোয় বের করে আনার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তিতুমীর। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দক্ষিণ্য পুষ্টি জমিদার ভূস্বামী গণের আগ্রাসন থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন তিনি। তাই বাঁশের কেলায় যুদ্ধের সময় তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় প্রতিবাদের ধ্বনি— “শুধু ফিরিঙ্গি শাহী শেষ নয়, আজ থেকে বাংলায় কোন জমিদারের কোন অধিকার নেই। এক বিঘৎ জমি বা এক দানা ধানে তাদের দখলিয়ানা আমরা মানিনা। সব আমাদের, সব চাষীদের।”^{২৭৩} সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিতুমীর সর্বস্বত্যাগ করেছেন। কিন্তু দেশের এই সাধারণ মানুষদের ভূয়ো আইন তৈরী করে শোষণ করছে ইংরেজ ও তার মদতপুষ্টি জমিদাররা। তাই তিতুমীর এই অন্যায় আইনকে মানতে রাজী নন। যোদ্ধাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ— “আইন আদলত পোড়াতে হবে। এই আইন আমাদের আইন নয়, শোষণের আইন।”^{২৭৪}

সরফরাজ পুরের ঘাটে দারোগার হাতে ধৃত দরিদ্র মানুষদের তিতুমীর কৌশলে রক্ষা করেন এবং সবাইকে জেহাদের মস্ত্রে দীক্ষিত করেন। প্রতিটি মানুষের যে যথার্থ মর্যাদার সহিত বাঁচবার অধিকার রয়েছে তা তিনি সকলকেই জানিয়ে দেন। ধৃত ছিঁরু, আমন, কলু, সকলকেই তিনি আশ্বস্ত করেন। “তোমার নাম ছিঁরু নয়, শ্রী নিবাস, সেটা মনে রেখে মাথা উঁচু কর। আমন নয় আমিনুল্লা, কলু নয় কৈলাস, মতি নয় মতিউদ্দিন।”^{২৭৫} এভাবে চাষী, চামার, মজুর, প্রত্যেকটি মানুষকেই একজন যথার্থ মানুষের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন তিতুমীর, তার সাথে নির্দেশ করেছেন মাথা উঁচু করে বাঁচবার পথ।

কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন করতে চেয়েছিলেন তিতুমীর। আর সে কারণেই তিনি গ্রাম বাংলার কৃষক মজদুরদের সজাগ করে তোলবার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। এ কাজে তিনি উৎসাহিত করেন কবিরাল সাজন গাজী ও শঙ্কর দাসকে। এদের গানের মধ্যে নিহিত জাতীয় চেতনার বীজ, যা এদের গানের মাধ্যমেই দেশবাসীর কাছে প্রচারিত হয়। জমিদার

ও ইংরেজদের গোপন কথা, অন্যায় অবিচারের কথা ব্যক্ত হয় এদের গানে—

“ছুঁচ হয়ে তো ঢুকলে যাদু

এখন বেরচ্ছ ফাল হয়ে

কতকাল আর ও ফাঁকা চাল

থাকব বল সয়ে?

হাঁড়ির হাল তো করেছ বাপ

সব নিয়েছ লুঠে

এদেশের আর রেখেছ কী

বিদেশী ক'জন জুটে?”^{২৭৬}

এসব গানের কথা যে জমিদার ও ইংরেজদের পক্ষে বিপদ জনক সে কথা তারা বুঝতে পারে। গান গাওয়ার সুবাদেই সাজন গাজীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। তাই গান গাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গোয়েন্দা গিরি করতেন এবং ইংরেজদের যাবতীয় পরিকল্পনার কথা পৌঁছে দিতেন তিতুমীরের কাছে, যা তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ কৌশল পরিচালনার সহায়ক। “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমেই শোষিত নিপীড়িত জনতার মানস জমিনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, নাট্যকার এই বোধ থেকেই সাজন গাজী ও শক্রঘ্ন দাস অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম দুটি কবিরাল চরিত্রের সৃষ্টি করেন।”^{২৭৭}

ইংরেজদের মোসাহেব দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর অর্থলোলুপ নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে। সরফরাজপুরের ঘাটে পাইকার মুচিরাম ভাণ্ডারী ও চৌকিদার হরু সর্দার লণ্ঠন নেড়ে নেড়ে নৌকাকে ইঙ্গিত করছে এমন সময় ঘাটে এক নৌকা আসে, দারোগা রামরাম চক্রবর্তীও উপস্থিত হয় সেখানে।

চাঁদপুরের দরিদ্র কৃষক অশ্বিনী কুঠির নীলকর সাহেবদের হিংস্র নজর থেকে মেয়ে চাঁপাকে বাঁচাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নারকেলবেড়িয়ায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সরফরাজপুরের ঘাটে তাদের নৌকা আটকানো হয়। শুধুমাত্র কিছু টাকার জন্য দারোগা রামরাম চক্রবর্তী চাঁপাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তার প্রভু পাইরনের হাতে সমর্পণ করে। আর ক্রফোর্ট পাইরন উপটৌকন হিসেবে চাঁপাকে প্রদান করে ক্যাপ্টেন ব্রাউনের হাতে।

এছাড়াও দারোগা রামরাম চক্রবর্তী দরিদ্র কৃষকদের ধরে নিয়ে গিয়ে কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেয়। কোম্পানী এদের পাঠায় লবণ সংগ্রহের কাজে। কোম্পানীকে মানুষ চালান দিতে পারলে দারোগা প্রতি মানুষের জন্য তিনশ টাকা করে বকশিস পায়। আর এসব মানুষের অনেকেই

প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় সুন্দর বনের প্রতিকূল পরিবেশে। কোম্পানীর দালাল হাকিম মোল্লা জঞ্জালী নামক এক উন্মাদ মহিলাকে ধরে আনে, এই সরফরাজপুরের ঘাটেই তার বিরুদ্ধে পাগলামির অভিযোগ রয়েছে। বেঞ্জামিন সাহেবের কুঠিতে সে আশ্রয় দিয়েছে।

জঞ্জালী আসলে উন্মাদ নয়। গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার রতিকান্ত রায়ের রক্ষিতা ছিল সে। বয়স হয়ে গেলে জমিদার তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইংরেজ ও ইংরেজদের মোসাহেব জমিদারদের ঘৃণ্য মানসিকতাকে সে ধিক্কার জানিয়েছে। বেঞ্জামিন সাহেব সে কুঠিতে নাবালিকা মেয়ে ধর্ষণ করেছে। মনের ক্ষোভ তেলে দিয়েছে জঞ্জালী সেই কুঠিতে। তাই সে কুঠিতে আশ্রয় ধরিয়ে দিয়েছে। “কচি মেয়ে-কচি মেয়ে-কচি ধরে নিয়ে গেছিল গাঁ থেকে। তার গা থেকে রক্ত বারছিল ঐ কুঠিতে শুয়ে। যেমন আমার সব শুয়ে নিয়েছিল গোবিন্দপুরের রাজা। আশ্রয় দিয়ে ঐ কুঠি ছাই করব না? করবই তো। মায়ের বুকজোড়া মতন মেয়েটাকে ধর্ষণ করে গোরারা? আশ্রয় দিয়েছি বেশ করেছি!”^{২৭৮}

শুধু এসব কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি জঞ্জালী। সে দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর মুখোশটিকেও খুলে দিয়েছে—“আর দারোগা বাবু, তুমিই যে বিভাবতীকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে সাহেবের কুঠিতে দিয়ে এসেছিলে তাও আমি দেখেছি।”^{২৭৯}

নিজের অপমানের কথা সহ্য করতে না পেরে দারোগা রামরাম চক্রবর্তী কোম্পানীর হত্যা আইন অনুযায়ী জঞ্জালীকে ইট মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয় হাকিম মোল্লাকে। এমন সময়ে ফকিরের ছদ্মবেশে এসে তিতুমীর রক্ষা করেন জঞ্জালীকে। তাকে বোনের মর্যাদা দেন এবং নতুন নাম দেন হাসিনা। হাসিনার প্রতি তিতুমীরের আশ্রয় বাণী—“হাসিনা তুমি আমার ভগ্নী, আমার জেহাদ।”^{২৮০}

তিতুমীর যখন তার সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দেন—“সব মুজাহিদকে জড়ো কর। পুঁড়া শহর জ্বালিয়ে ছাই ক’রে, কৃষ্ণরায়ের লাস চৌরাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে আসতে হবে।”^{২৮১} ঠিক তখনই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে জঞ্জালী এবং তার মনের ভিতরের সুপ্ত বাসনাকে ব্যক্ত করে—“লিখতে জানলে লিখতাম—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।”^{২৮২}

জঞ্জালী তার জীবনের সমস্ত কিছুকে হারিয়েছে, এমনকি তার মুখের হাসিটুকুও। কিন্তু বাকের মণ্ডল গোকনার জমিদার বাড়িতে যে শিশু পুত্র মধুসূদনকে কুড়িয়ে পেয়েছে, জমিদার রায়নিধি হালদারের নাতি, জমিদারের বংশধরকে, তাকে পেয়ে জঞ্জালী হেসেছে।

জমিদার তার নিজের বংশধর ছেড়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু জঞ্জালী শিশুটিকে প্রত্যাখ্যান করেনি জমিদারের বংশধর বলেই। বরং রাবেয়া যখন ঠাট্টা করে বলে—“এই বার

জমিদারের নাতিকে মানুষ কর গে।”^{২৮০} তখন জঞ্জালী জমিদার, জমিদারতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে কেবল মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছে অন্তর দিয়ে। “এই টুকু বাচ্চা আবার রাজা জমিদার কী?... যেমন মানুষ করব তেমনি হবে। রাজা-জমিদার আর থাকবে না। আমরা মরে যেতে পারি, কিন্তু জমিদাররা আর বাঁচবে না।”^{২৮১} এভাবেই ফেটে পড়েছে জঞ্জালীর ক্ষোভ, ‘তিতুমীর’ নাটকে যা শোষিত অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ।

তিতুর পত্রবাহক আমিনুল্লা ওরফে আমন কৃষ্ণদেব রায়কে তিতুর চিঠি দিতে গেলে তাকে কৃষ্ণদেব রায় হত্যা করার নির্দেশ দেন। আমিনুল্লাকে শহীদ হতে হয়। এই কঠোর শাস্তির মুখেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমিনুল্লা দৃঢ় সংকল্প ছিল। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম নাম রাখা এবং দাড়ি রাখার মধ্যে সে কোন অন্যায় দেখতে পায়না। বরং গর্বের সঙ্গে জানায়— সেটা তাদের ধর্মের সংস্কার। আর জমিদারের ধান চুরি করার প্রসঙ্গে আমিনুল্লার কাছে জানতে চাওয়া হলে সে কৃষ্ণদেব রায়কে নির্দিষ্ট জানায়—“আমার মুর্শিদ বলেন, ধান আপনার নয়, যে জমি চষে তার। আপনি কি কখনো লাঙলে হাত দিয়েছেন ছজুর?”^{২৮২}

তিতু তাঁর আন্দোলনকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী চালনা করতে চেয়েছিলেন। এ মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন সৈয়দ ব্রেলভিরাজির কাছে। তিনি নিজেকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন, ধূর্ততার সঙ্গে এবং কৌশলে তিনি যুদ্ধ জয়ের ছক কষেছিলেন। ইংরেজদের এবং জমিদারদের বারবার আক্রমণের পরে এমনকি আমিনুল্লা খুন হবার পরেও ‘সাপ ফণা তোলেনি।’^{২৮৩}

সম্মুখ সমরকে এড়িয়ে তিতুমীর কৌশলগতভাবে জমিদার ও কোম্পানীর শক্তিকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিলেন। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে আঘাতে আঘাতে অবসন্ন করে যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাব মীরকাশিমের ঘোড় সওয়ার মিসকিন শা তিতুর রণকৌশলকে সম্মুখ সমরে রূপান্তরিত করে। তিনিই তিতুকে উৎসাহিত করেন বাঁশের কেলা নির্মাণে শেষ মুহূর্তে মিসকিন শা তিতুকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বললেও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরযোদ্ধা তিতুমীর যেন আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। মিসকিন শা’র অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং কটাক্ষ করে বলেন—

“আমি তো চেয়েছিলাম। অন্যভাবে লড়তে। মেঘের আড়াল থেকে অস্ত্র হেনে হেনে শত্রুকে অবসন্ন করে জিততে চেয়েছিলাম। তুমিই তো আমায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের আত্মহত্যায়ে ঠেলে দিলে, তুমিইতো এই বাঁশের কেলায় আমাদের বন্দী ক’রে দিলে! এটা কি যুদ্ধের তরিকা একটা? একজায়গায় আটকে থেকে? না, উচিত ছিল বন জঙ্গল খাল বিলের মাঝে অনবরত ঘুরে বেড়ানো। না, আমি

পালাবনা মিসকিন শা, কারণ এরা সব মরছে, নারকেলবেড়িয়ায় সব মরছে আর
আমি এদের সাথী, আমি কোথায় যাব?”^{২৮৭}

তিতু শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন আর সকলের সাথে।

মিসকিন শা তিতুকে একবার শাহাদাৎ বরণে উৎসাহিত করে আবার পালাতে বলেছেন এতে তার চরিত্রের স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিতুমীর তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। “উৎপল দত্ত ইতিহাসের এক জটিল রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি তথা কৃষক বিদ্রোহকে মার্কসীয় দর্শনের আলোয় ‘তিতুমীর’ নাটকে তুলে এনেছেন। ‘তিতুমীর’ তাই ঐতিহাসিক নাটক হয়েও সমকালের। এ নাটক প্রতিবাদের, প্রতিরোধের এবং প্রতিশোধের।”^{২৮৮} এই প্রতিবাদ রাজশক্তি ও জমিদার বা মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক শ্রেণীর প্রতিবাদ।

নাটকটিতে যে যে রূপে বা মুহূর্তে প্রতিবাদ প্রকটিত হয়েছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক্রফোর্ড পাইরনের আড্ডাখানায় কিছু কথা ব্যক্ত হয়েছে পাইরনের মুখ দিয়ে। কথাগুলি বলা হয়েছে কৃষ্ণদেব রায়ের প্রতি। তাতে তিতুর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের কথা আছে। তিতু প্রজাদের সচেতন করেছেন ব্রিটিশ শক্তি ও জমিদার তথা মালিকদের বিরুদ্ধে; প্রজাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা দিচ্ছেন, কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারির পাশেই তিতু যেন বুক টান করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ রোপণ করা হচ্ছিল। সাজন গাজী ও শত্রুঘ্ন দাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে।

সরফরাজপুরের ঘাটে ধৃত সাধারণ মানুষদেরকে পুলিশের কাছ থেকে মুক্ত করে তাদের সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে নামের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের মাধ্যমে প্রতিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তিতুমীর মক্কা থেকে ফিরে এসে এদেশে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন, তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজের পুনরুজ্জীবন। তাঁর একটা লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের আরবী নাম রাখা। উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে এই বিষয়টিকে শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে আবদ্ধ না রেখে সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিতুমীরের লক্ষ্যকে তা অনেক দূর প্রসারিত করে দিয়েছে। ছিরু, আমন, কালু এসব নামের দ্বারা গ্রামীণ সমাজে এসব মানুষের তুচ্ছতা বোঝানো হয়। তিতুমীর সম্পূর্ণ নামকরণ করে তাদের সম্মান দেন। লক্ষণীয় যেটা ছিল আরবি নাম রাখার দ্বারা মুসলমান সমাজে ইসলামী করণকে শুদ্ধ করা, নাট্য প্রয়োগে তা ব্যাপক তাৎপর্য পেয়েছে।

দারোগা রামরাম চক্রবর্তী সুন্দরবনে লবণ তৈরির জন্য কোম্পানীকে শ্রমিক চালান দিয়ে

টাকা উপার্জন করে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদী ভাষা বর্ষিত হয়েছে।

গোরা সাহেবদের নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে জঞ্জালী চরিত্রটি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তাই সে গোরা সাহেবের কুঠিতে আঙুন লাগিয়ে দেয় এবং জমিদারদের মৃত্যু কামনা করে।

কোম্পানীর কর্মচারী এবং জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, দেবনাথ রায় প্রমুখ শত্রুদের প্রত্যেককে হত্যা করা, নারিকেল বেরিয়ার বাঁশের কেঁলার যুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে জোড়ালো প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও স্থানীয় জমিদারদের বিলাসবহুল জীবনের ত্রিণ্যাকলাপের মাধ্যমে সমাজে ত্রাসের সৃষ্টি হয় যা দর্শক এবং সচেতন মানুষের কাছে ঘৃণা বা ক্ষোভের বিষয়। আর এই ক্ষোভ ক্রমে দানা বেধে কৃষক বিদ্রোহের আকার নেয়।

তিতুমীর নাটকে ইতিহাসের তথ্যকে সামনে রেখে নাট্যকারকে revolutionary theatre গড়ে তুলতে হয়েছে। ইতিহাসে তিতুমীরের ভূমিকা মুসলমান সমাজে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করা। একাজ ফরাজী আন্দোলনের নেতারাও এক ভাবে করেছিলেন এবং সে কাজ করতে নেমে তারা দেশে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তিত শাসন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। তাতেও হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। ফরাজী মতবাদ প্রসারিত হবার ফলে জমিদার নীলকর ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা হয়েছিল।^{২৯০} কিন্তু এই আন্দোলন কার্যত হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল।^{২৯১} কিন্তু ডানবার যে রিপোর্ট দেন তাতে তাদের দিক থেকে কোনো ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা ছিল না বলেই জানান।^{২৯২} অন্য পক্ষে বাংলাদেশে যে ওয়াহাবি আন্দোলন (একে অবশ্য তিতুমীর বা তাঁর পক্ষের কেউ এ নামে অভিহিত করেননি) তাতে তিতুমীর মুসলমান সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে আরম্ভ করে হিন্দু মুসলমান সামঞ্জস্যের কথা বলে তাদেরও তাঁর অনুগামী করে তোলেন। “যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের সহিত কেবল ধর্মে ব্যবধানের জন্য অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল পছন্দ করেন না।”^{২৯৩} এ কথায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মনেও আশ্বাস জন্মেছিল। ‘তিতুমীর’ নাটকে সে জন্য দেখি হিন্দুরাও এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। নাট্যকার নাটকের প্রথম দৃশ্যে ক্রফোর্ড পাইরনের মুখে তিতুমীরের সম্বন্ধে আশঙ্কার কথা যখন শুনিয়েছেন তখন হিন্দু জমিদারেরা তাতে মন দেননি। দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার যেভাবে দেশীয় প্রজাদের উপর ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত কর নীতির কথা দেখালেন, তাদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ আনলেন তাতে এদেশের মানুষের অবস্থা স্পষ্ট হল। দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার যা দেখালেন

- ১) প্রজাদের উপর কর ভার বৃদ্ধি
- ২) দারোগা গরীর মানুষদের নিমকের কারবারে চালান দিয়ে বকশিস পাচ্ছেন
- ৩) দারোগা গ্রামের মেয়েদের ইংরেজ কুঠিতে চালান দিচ্ছেন
- ৪) অন্যায় ভাবে দেশীয় মানুষদের উপর পীড়ন চলছে

প্রথম অঙ্কের তিতুমীরের সম্বন্ধে সতর্কতার সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের দেশীয় মানুষের উপর অত্যাচারের ঘটনা দেখিয়ে এবং চমকপ্রদভাবে তিতুমীরের উপস্থিতি ঘটিয়ে নাট্যকার দুটি প্রতিপক্ষকে পায় মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার শুধু সময় ও ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে শেষ লড়াই-এ নামার অপেক্ষা। এর পরের দৃশ্যগুলিতে ঘটনাক্রম উর্ধ্বমুখী হয়ে নাটকে rising action তৈরি করেছে এবং নাটকের climax -এর দিকে এগিয়ে গেছে। এই নাটকের একদিকে আছে ক্রফোর্ড পাইরন এবং তার সহযোগী দেশীয় জমিদারবর্গ, অন্যদিকে তিতুমীর ও এদেশের নারী পুরুষ গরীব হিন্দু মুসলমান প্রজা—তারা এই জমিদার ও প্রশাসন ও ইংরেজ শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত। এই ভাবে নাট্যকার শোষক ও শোষিত দুই পক্ষ গড়ে তুলেছেন। এবং তাদের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মহড়া করেছেন। কিন্তু নাট্যকার জানেন এ নাটকে দেশীয় জমিদারদের ভূমিকা কিংবা দেশীয় দারোগার ভূমিকা নগণ্য। এমনকি ক্যাপ্টেন ব্যাণ্ডনও একটা সময় অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। দেশীয় জমিদারদের কাউকে কাউকে তিনি জারজ সন্তান বলে অভিযোগ করে তাদের সম্পত্তিচ্যুত করেন দেবনাথ রায় যে সত্যই জারজ সন্তান তাও নাট্যকার পরে দেখিয়ে দেন। এ নাটকের একদিকের কুশীলব তিতুমীর ও তাঁর অসহায় দুর্বল নিরস্ত্র প্রজাবর্গ তাদের সহায় কেবল জমিদার ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা এবং ক্রোধ। তারা কৌশলী যোদ্ধা নয় কিন্তু তাদের উপর অত্যাচারে তাঁরা অত্যন্ত অস্বস্তি হয়ে সরল পথে ইংরেজের বিরোধিতা করতে নেমেছে। তিতুমীরেরও এ অসম লড়াইতে প্রথমে আপত্তি ছিল। অন্যদিকে সব কিছুর মূলে আছে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ক্রফোর্ড পাইরণ— যে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে তিতুমীরের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে নামিয়েছে। লাটুবাবুর বাড়ির সভায় কী করতে হবে তা এক প্রকার dictate করে দিয়েছে। আবার প্রয়োজন মত জমিদারদের ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। ব্যাণ্ডন যোদ্ধা—কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিতে যখন সে অত্যন্ত বিচলিত তাকে সরিয়ে দিয়ে পাইরণ আর্টিলারি বাহিনী পাঠিয়েছে কর্ণেল স্টুয়ার্ট -এর নেতৃত্বে। কৃষ্ণ রায় বলেছে—“মানে আমরা বলির পাঁঠা।”^{২২০} ক্রফোর্ড পাইরণ তার উত্তরে বলেছে “আশা করি ব্রিটিশ জয়ের স্বার্থে আপনারা হাসি মুখে মরবেন।”^{২২১} ব্যাণ্ডনকে বলেছে “আপনারা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লায়াবিলিটি।”^{২২২} এই ভাবে পাইরণই পিছনে থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। ব্যাণ্ডন বলেছে “বণিকের কী হিসেব! সওদাগরের কী বুদ্ধি!”^{২২৩} তিতুমীর

বলেছে “পাইরণ সাহেব বুজর্গ লোক, পণ্ডিত শুধু পুরানো কিতাব পড়ে—আর তলে তলে আস্ত একটা জাতির খাদ্য, স্বাধীনতা, ইজ্জৎ, ইমান সব কেড়ে নেয়ার যড়যন্ত্র করে।”^{২৯} নাট্যকার শেষ পর্যন্ত দেখাচ্ছেন এ যুদ্ধে তুমীর বা বাংলাদেশের প্রজা বা জমিদার কেউ কিছু নয় আসল লক্ষ্য বণিকের স্বার্থ সিদ্ধি। সেই বণিকের স্বার্থ রক্ষার কাজটা করেছে ক্রফোর্ড পাইরণ। আর বণিকের প্রয়োজনে কাউকে ছাড়া নয়। সে জমিদার, সাজন গাজী এমন কি এদেশের প্রজাদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে। চাঁপাকে সে ব্যাণ্ডনের জন্য কিনেছে কিন্তু তার বাবা অশ্বিনীকে তার বন্ধু বলে সম্বোধন করে। বণিকের কাছে সবই পন্য। ষোড়শ শতকের পুথি বা দ্বাদশ শতকের মূর্তি সবই তার প্রয়োজন কেননা এসব থেকেই সে খুঁজে পায় দেশের ভিতরকার রূপটাকে—যা তার আরও প্রয়োজন। উনিশ শতকের শাসকশ্রেণী এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ইংরেজ শাসনকে দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার কাজও একই ভাবে করে গেছেন। নাট্যকার উৎপল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্রফোর্ড পাইরণের চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করে সাম্রাজ্যবাদের সর্বশক্তিমান রূপটিকে প্রকাশ করেছেন। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রহীন দেশীয় মানুষদের আবেগমাত্র সম্বল করে যে জেতা যায় না—পরাজয়ই যে তার নিয়তি—তা জেনেও যুদ্ধ করা ছাড়া যে আর কোনো পথ নেই তাও দেখিয়েছেন। সারা পৃথিবীর একই পরিণতি ইতিহাসে ঘটেছে। অফ্রিকায় এশিয়ায় দক্ষিণ আমেরিকায় সর্বত্রই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তবু মানুষের সংগ্রাম থেমে যায় না। অত্যাচারিত নিপীড়িত জনতা চিরকালই শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে—হয়ত কখনো কোনো একদিন সে জয়লাভ করতে পারবে এই আশাই তার এসব যুদ্ধের প্রেরণা। নাট্যকার শোষিত মানুষের এই যুদ্ধ এবং তার পরাজয়ের ইতিহাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন শুধু সেই আগামী দিনের যুদ্ধের প্রেরণা যোগাতে, মানুষ পরাজয়ের পথে শিক্ষা নিয়েই একদিন জয় লাভ করবে এই অনুচ্চারিত আশার বাণীই তাঁর প্রতিটি নাটকের অভিপ্রায়।

উৎপল দত্তের উক্তনাটকগুলি আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, সমাজজীবনে বা ব্যক্তিজীবনের নানা রকম সমস্যা বা সংকট থেকেই প্রতিবাদের জন্ম হয়। অন্যের দ্বারা অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত বা অত্যাচারিত হয়ে আত্ম জাগরণ ঘটে। ফলে মানুষ এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ জানায়। মানুষের এই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নানা মাত্রায় প্রকাশ পায়। মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি তা প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে।

তাছাড়া নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্তা, ক্রিয়াকর্ম, আত্মপ্রকাশ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত থাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বীজ। চরিত্রগুলি কখনো আত্মসচেতন ভাবে, কখনো সঞ্চারিত বোধের মাধ্যমে অথবা কখনো অন্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ

গড়ে তোলে, চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তাও কখনো প্রতিবাদ হতে পারে। “তাই প্রতিবাদের মাত্রাভেদ আছে, কোন প্রতিবাদ বিপ্লবের মতো প্রবল ও উচ্চকিত, কখনো মধ্যম আবার কখনো দুর্বল। কখনো উপেক্ষা বা নীরবতাই হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদের সুতীর ভাষা।”^{২৯৮}

এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে কখনো সমাজব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে, আবার তেমনি পরিবর্তন ঘটতে পারে মানুষের মনোজগতের। জাগরণ ঘটে মানুষের সুপ্ত চেতনার, মানুষ হয়ে উঠে আত্মসচেতন বা শ্রেণীসচেতন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি (জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা), ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পৃ. ০৯।
২. শোভা সেন, স্মরণে-বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪২।
৩. তদেব, পৃ. ৪৬।
৪. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৫২।
৫. শোভা সেন, স্মরণে-বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৬।
৬. তদেব, পৃ. ৪৭।
৭. তদেব, পৃ. ১০৬।
৮. তদেব, পৃ. ১০৬।
৯. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্তঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৫৫৫।
১০. উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, নিবেদন অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০৫।
১১. উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মুখবন্ধ অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ০১।

১২. তদেব, জবাবদিহি অংশ, পৃ. ৬৬।
১৩. উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, পরিশিষ্ট, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৬৪২।
১৪. উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, নাট্যশোধ সংস্থান, ফাইল নং ১৮৭/৪৬৩, রেজিস্ট্রেশন নম্বর - II.
১৫. উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০০৭, পৃ. নয়।
১৬. তদেব, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৫৭৩।
১৭. তদেব, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৫৭৩।
১৮. তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃ. দশ।
১৯. তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃ. নয়।
২০. অনল গুপ্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, অনুক্রমণিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ৬।
২১. তদেব, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পৃ. ৪১৫।
২২. তদেব, পৃ. ৪১৫।
২৩. জোহন দস্তিদার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৯।
২৪. তদেব, ভূমিকা অংশ।
২৫. তদেব, সৌভিক রায় চৌধুরী, গ্রন্থ পরিচয় অংশ।
২৬. তদেব, উৎপল দত্ত, লেনিনের ডাক, নাটকের উৎসর্গ অংশ, ১লা মে, ১৯৭০, পৃ. ৯৫।
২৭. তদেব, সৌভিক রায়চৌধুরী, গ্রন্থ পরিচয় অংশ।
২৮. তদেব, গ্রন্থ পরিচয় অংশ।
২৯. তদেব, গ্রন্থ পরিচয় অংশ।
৩০. দেবব্রত বিশ্বাস (সম্পাদিত), বাংলা নাটকের প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, কোলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩২৯।
৩১. উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, পঞ্চমখণ্ড, নাটক পরিচিতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ পৌষ ১৪১১, পৃ. ৬০২।
৩২. তদেব, পৃ. ৬০২।

৩৩. তদেব, পৃ। ৬০৪।
৩৪. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ১৩।
৩৫. তদেব, নাটক পরিচিতি, পল. ৬৫৩।
৩৬. তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৭।
৩৭. তদেব, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৬৫৫।
৩৮. তদেব, পৃ. ৬৫৫।
৩৯. উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫, পৃ. ৬৪৬।
৪০. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৬৫৭।
৪১. তদেব, পৃ. ৬৫৮।
৪২. তদেব, পৃ. ৬৫৮।
৪৩. মহেন্দ্র গুপ্ত, একটি প্রয়োজনীয় নাটক, এপিক থিয়েটার, ৮-১২/১৯৮৯ সংখ্যা, পৃ. ৪৭।
৪৪. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৬৬০।
৪৫. তদেব, পৃ. ৬৬১।
৪৬. উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৬৩৭।
৪৭. তদেব, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৬৩৯।
৪৮. অসিত বসু, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, মুখবন্ধ, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৯, পৃ. ১।
৪৯. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, তদেব, গ্রন্থ পরিচিতি, পৃ. ৩০৯।
৫০. অসিত বসু, তদেব, মুখবন্ধ, পৃ. ৪।
৫১. পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ০৫।
৫২. জাপেন দা জপেন খা, পৃ. ১২৫।
৫৩. তদেব, পৃ. ৫।

৫৪. উৎপল দত্ত, অঙ্গার, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৬৯।
৫৫. তদেব, পৃ. ৬৯।
৫৬. তদেব, পৃ. ৭৩।
৫৭. তদেব, পৃ. ১০৩।
৫৮. তদেব, পৃ. ১০২।
৫৯. তদেব, পৃ. ১০৫।
৬০. তদেব, পৃ. ১২০।
৬১. তদেব, পৃ. ১৩৫।
৬২. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৬৩. তদেব, পৃ. ১৪৪।
৬৪. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৭৩।
৬৫. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্রোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ৪৫২।
৬৬. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্রোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১১৫।
৬৭. উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোল - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫, নাটক পরিচিতি, পৃ. ৬৩৭।
৬৮. মনোজ মিত্র, ফেরারী ফৌজ নাটকের ভূমিকা অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৫০।
৬৯. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০), প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮০।
৭০. উৎপল দত্ত, ফেরারী ফৌজ, প্রথম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৫২।
৭১. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্রোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১২৫।
৭৩. তদেব, অষ্টম দৃশ্য, পৃ. ২২৩।

৭৪. তদেব, নবম দৃশ্য, পৃ. ২২৭।
৭৫. তদেব, নবম দৃশ্য, পল. ২২৮।
৭৬. তদেব, পৃ. ২২৯।
৭৭. তদেব, পৃ. ২২৯।
৭৮. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০), প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮০-৮১।
৭৯. ফেরারী ফৌজ নাটকের ভূমিকা অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোল- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৫০।
৮০. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১২৭।
৮১. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১২৭।
৮২. উৎপল দত্ত, মানুষের অধিকারে, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৭১।
৮৩. তদেব, পৃ. ৭৩।
৮৪. তদেব, পৃ. ৭২।
৮৫. তদেব, পৃ. ৭৫।
৮৬. তদেব, পৃ. ৭৫।
৮৭. তদেব, পৃ. ৭৭।
৮৮. তদেব, পৃ. ৮১।
৮৯. তদেব, পৃ. ৭৯।
৯০. তদেব, পৃ. ৮১।
৯১. তদেব, পৃ. ৮২।
৯২. তদেব, পৃ. ৮৩।
৯৩. তদেব, পৃ. ৮৩।
৯৪. তদেব, পৃ. ৮৪।
৯৫. তদেব, পৃ. ৮৪।
৯৬. তদেব, পৃ. ৮৫।

৯৭. তদেব, পৃ. ৮৫।
৯৮. তদেব, পৃ. ৮৫।
৯৯. তদেব, পৃ. ৮৫।
১০০. তদেব, পৃ. ৮৪।
১০১. নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাটোৎসব কমিটি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ৩৭৪।
১০২. তদেব, পৃ. ৩৭৪।
১০৩. উৎপল দত্ত, মানুষের অধিকারে, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল - ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১৩৭।
১০৪. তদেব, পৃ. ১৩৭।
১০৫. পবিত্র সরকার, লিটল থিয়েটার গ্রুপের মানুষের অধিকার, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাটোৎসব কমিটি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ৩৭৪।
১০৬. সত্য ঘোষ, মানুষের অধিকার প্রসঙ্গে, দেশব্রতী, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ৩৫১।
১০৭. তদেব, পৃ. ৩৫১।
১০৮. তদেব, পৃ. ৩৫৩।
১০৯. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাটোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১২০।
১১০. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০), প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮২।
১১১. উৎপল দত্ত, সমাজতান্ত্রিক চাল (পথনাটিকা), উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৫৩৬।
১১২. তদেব, পৃ. ৫৪৩২, ৫৪৪।
১১৩. তদেব, পৃ. ৫৪৭।
১১৪. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাটোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১১৯।
১১৫. তদেব, পৃ. ১২৫।
১১৬. তদেব, পৃ. ১২৬।

১১৭. তদেব, পৃ. ১২৬।
১১৮. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব কমিটি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কোল - ৭৩, পৃ. ৪৫৭।
১১৯. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ. ৪৬৮।
১২০. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোল, ১৩৮৮, পৃ. ৪৫।
১২১. তদেব, পৃ. ৪৮।
১২২. তদেব, পৃ. ৫৪।
১২৩. তদেব, পৃ. ৮১।
১২৪. তদেব, পৃ. ৮৪।
১২৫. তদেব, পৃ. ৮৪।
১২৬. তদেব, পৃ. ৯৬।
১২৭. তদেব, পৃ. ৯২।
১২৮. তদেব, পৃ. ১০৫।
১২৯. তদেব, পৃ. ১০১।
১৩০. উৎপল দত্ত, কল্লোল, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৩৭।
১৩১. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোল, ১৩৮৮, পৃ. ৮৪।
১৩২. উৎপল দত্ত, কল্লোল, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৫৩।
১৩৩. তদেব, পৃ. ২৫৫।
১৩৪. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোল, ১৩৮৮, পৃ. ৮৫।
১৩৫. উৎপল দত্ত, কল্লোল, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৫৫-২৫৬।
১৩৬. তদেব, পৃ. ২৩৮।
১৩৭. তদেব, পৃ. ২৬০।
১৩৮. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১১৪।

১৩৯. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৪০. তদেব, পৃ. ১১০।
১৪১. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্যদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ. ৪৭২।
১৪২. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুক্স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১০০।
১৪৩. তদেব, পৃ. ১০৬।
১৪৪. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৪৭৩।
১৪৫. উৎপল দত্ত, কল্লোল, সপ্তম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৮৩।
১৪৬. তদেব, পৃ. ২৮৩।
১৪৭. তদেব, ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃ. ২৭৬।
১৪৮. তদেব, নবম দৃশ্য, পৃ. ২৯৯।
১৪৯. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৮২।
১৫০. উৎপল দত্ত, কল্লোল, সপ্তম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৩১১।
১৫১. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৮২।
১৫২. ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, নৌবিদ্রোহের ইতিহাস, বুক্স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস্, কোলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১০১।
১৫৩. তদেব, পৃ. ১০৩।
১৫৪. উৎপল দত্ত, অজেয় ভিয়েতনাম, প্রথম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ১৭০।
১৫৫. তদেব, তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ২০৪।
১৫৬. তদেব, তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ২০৭।
১৫৭. তদেব, তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ২০৯।
১৫৮. উৎপল দত্ত, অজেয় ভিয়েতনাম, প্রথম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ১৬৪।

১৫৯. তদেব, পৃ. ১৬৭।
১৬০. তদেব, পৃ. ১৭০।
১৬১. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৮৩।
১৬২. উৎপল দত্ত, Theatre as Weapon of Revolution, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, দে'জ পাবলিশিং, কোল- ৭৩, পৃ. ১১৫।
১৬৩. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৬৪. তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬।
১৬৫. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৬৬. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৬৭. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৮৪।
১৬৮. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, ০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, পৃ. ৭৮।
১৬৯. উৎপল দত্ত, তীর, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ২২৪।
১৭০. তদেব, পৃ. ২৩২।
১৭১. তদেব, পৃ. ৩০৫।
১৭২. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১৭৩. তদেব, পৃ. ৩২৬।
১৭৪. উৎপল দত্ত, তীর, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ২১৮।
১৭৫. তদেব, পৃ. ২২৫।
১৭৬. Bappaditya Paul, The First Naxal, Sage Publication, 2014, p. 101.
১৭৭. উৎপল দত্ত, তীর, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ২৩৩।
১৭৮. তদেব, পৃ. ২৪৭।
১৭৯. তদেব, পৃ. ২৪৯।

১৮০. তদেব, পৃ. ২৪৯।
১৮১. তদেব, পৃ. ২৪৮।
১৮২. তদেব, পৃ. ২৪৮।
১৮৩. তদেব, পৃ. ২৫৫।
১৮৪. তদেব, পৃ. ২৫৯।
১৮৫. তদেব, পৃ. ২৬০।
১৮৬. তদেব, পৃ. ২৬১।
১৮৭. তদেব, পৃ. ২৬২।
১৮৮. তদেব, পৃ. ২৮৫।
১৮৯. তদেব, পৃ. ২৮৪।
১৯০. তদেব, পৃ. ২৭৮।
১৯১. তদেব, পৃ. ২৯২-২৯৩।
১৯২. তদেব, পৃ. ২৯৪।
১৯৩. তদেব, পৃ. ৩১৪।
১৯৪. তদেব, পৃ. ৩১৭।
১৯৫. তদেব, পৃ. ৩১৭।
১৯৬. তদেব, পৃ. ৩১৭।
১৯৭. তদেব, পৃ. ৩১৭।
১৯৮. তদেব, পৃ. ৩২৪।
১৯৯. তদেব, পৃ. ৩২২।
২০০. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, ভূমিকা অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৭৩।
২০১. দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত, বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, কোল-৭, প্রথম প্রকাশ,
কোলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৩১।
২০২. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, ভূমিকা অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৭৩।
২০৩. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৭৯।

২০৪. দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত, বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, কোল-৭, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৩২।
২০৫. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৮০।
২০৬. তদেব, পৃ. ৯২।
২০৭. তদেব, পৃ. ১২৭।
২০৮. দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত, বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, কোল-৭, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৩৬।
২০৯. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ১৪০।
২১০. উৎপল দত্ত, সূর্যশিকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোল-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ১৮০।
২১১. তদেব, পৃ. ১৮০।
২১২. তদেব, পৃ. ১৮০।
২১৩. তদেব, পৃ. ১৯২।
২১৪. তদেব, পৃ. ১৯৮।
২১৫. তদেব, পৃ. ২১৩।
২১৬. D.N. Jha, Early India, A Concise History, Manohar, New Delhi, 2008, p. 179-180.
২১৭. তদেব, পৃ. ১৬৮।
২১৮. তদেব, পৃ. ১৬৮।
২১৯. উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভূমিকা অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪০১, p. xiv।
২২০. উৎপল দত্ত ব্যারিকেড, প্রথম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২২৬।
২২১. তদেব, অষ্টম দৃশ্য, পৃ. ২৭৫।
২২২. তদেব, পৃ. ২৭৬।
২২৩. তদেব, পৃ. ২৭৮।
২২৪. তদেব, সপ্তম দৃশ্য, পৃ. ২৬৭।

২২৫. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩০৪।
২২৬. উৎপল দত্ত, ব্যারিকেড, অষ্টম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২৭৯।
২২৭. ব্যারিকেড নাটকের শুরুতে ইয়ান পোটার্সেন এর লেখা একটি উদ্ধৃতি, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২১৬।
২২৮. উৎপল দত্ত, ব্যারিকেড, অষ্টম দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২৮০।
২২৯. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩০৬।
২৩০. উৎপল দত্ত, দুঃস্বপ্নের নগরী, তৃতীয় দৃশ্য, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ১৪২।
২৩১. তদেব, পৃ. ১২৮।
২৩২. তদেব, পৃ. ১২৯।
২৩৩. তদেব, পৃ. ১২৯।
২৩৪. তদেব, পৃ. ১৩১।
২৩৫. তদেব, পৃ. ১৩১-১৩২।
২৩৬. তদেব, পৃ. ৮৭।
২৩৭. তদেব, পৃ. ১৪৫।
২৩৮. তদেব, পৃ. ১৪৫।
২৩৯. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩০৭।
২৪০. তদেব, পৃ. ৩১৭।
২৪১. উৎপল দত্ত, মহাবিদ্রোহ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ২৯৭।
২৪২. তদেব, পৃ. ২৮৯।
২৪৩. তদেব, পৃ. ৩৩২।
২৪৪. তদেব, পৃ. ৩৩২।

২৪৫. তদেব, পৃ. ৩৫২।
২৪৬. তদেব, পৃ. ৩২৩।
২৪৭. তদেব, পৃ. ৩২৪।
২৪৮. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩১৬।
২৪৯. উৎপল দত্ত, এবার রাজার পালা, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ২৪৭।
২৫০. তদেব, পৃ. ২৪৭।
২৫১. তদেব, পৃ. ২৫৯।
২৫২. তদেব, পৃ. ২৬৪।
২৫৩. তদেব, পৃ. ২৬৯।
২৫৪. তদেব, পৃ. ২৭৪।
২৫৫. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩১৯, ৩২০।
২৫৬. উৎপল দত্ত, এবার রাজার পালা, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ২৮৬।
২৫৭. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩১৯, ৩২৩।
২৫৮. উৎপল দত্ত, এবার রাজার পালা, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ২৮৭।
২৫৯. তদেব, পৃ. ২৯৩।
২৬০. তদেব, পৃ. ২৯৩।
২৬১. তদেব, পৃ. ২৯৪।
২৬২. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩৩৪।
২৬৩. তদেব, পৃ. ৩৩৩।
২৬৪. তদেব, পৃ. ৩৩৩।
২৬৫. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ. ৭৩।

২৬৬. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, র্যাডিক্যাল, ২০১২, পৃ. ২৬৮।
২৬৭. তদেব, পৃ. ২৬৫।
২৬৮. তদেব, পৃ. ২৮২।
২৬৯. উৎপল দত্ত, তিতুমীর, ভূমিকা অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৩০০।
২৭০. তদেব, পৃ. ৩০৫।
২৭১. উৎপল দত্ত, তিতুমীর, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৩১০।
২৭২. তদেব, পৃ. ৩১১,
২৭৩. তদেব, পৃ. ৩৪১।
২৭৪. তদেব, পৃ. ৩৪২।
২৭৫. তদেব, পৃ. ৩২৫।
২৭৬. তদেব, পৃ. ৩১২-৩১৩।
২৭৭. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩২৮।
২৭৮. উৎপল দত্ত, তিতুমীর, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৩২৩।
২৭৯. তদেব, পৃ. ৩২৩।
২৮০. তদেব, পৃ. ৩৩৬।
২৮১. তদেব, পৃ. ৩৩৬।
২৮২. তদেব, পৃ. ৩৩৬।
২৮৩. তদেব, পৃ. ৩৬১।
২৮৪. তদেব, পৃ. ৩৬১।
২৮৫. তদেব, পৃ. ৩২৮।
২৮৬. তদেব, পৃ. ৩৩২।
২৮৭. তদেব, পৃ. ৩৬১।
২৮৮. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩৩২।

২৮৯. অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ. ৫২।
২৯০. তদেব, পৃ. ৫২।
২৯১. তদেব, পৃ. ৫৭।
২৯২. তদেব, পৃ. ৭২।
২৯৩. মোঃ জাকিরুল হক, দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, (১৯৪৩-১৯৯০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃ. ৩৫৭।
২৯৪. তদেব, পৃ. ৩৫৭।
২৯৫. তদেব, পৃ. ৩৫৮।
২৯৬. তদেব, পৃ. ৩৫৮।
২৯৭. তদেব, পৃ. ৩৫৯।
২৯৮. দেবব্রত বিশ্বাস সম্পাদিত, বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট
মার্কেট, কোলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩১৬।